শনিবারের চিঠি

২৫ ফাল্গুন ১৩৯১ □ ৯ মার্চ ১৯৮৫

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

স্ক্যান ঃ রূপালী গোশাভী

হার্ডকপি ও এডিট ঃ সুজিৎ কুণ্ডু

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

আমাদের প্রকাশিত চিরায়ত গ্রন্থরাজি

* রচনাবলী – মানিক গ্রন্থাবলী (১৩ খণ্ডে সমাপ্ত) ।। বনফুল রচনাবলী (১৯ খণ্ড প্রকাশিত) ।। বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ (৯ খণ্ড প্রকাশিত) ।। অচিন্ত্যকুমার রচনাবলী (১০ খণ্ড প্রকাশিত) ।। নরেন্দ্রনাথ মিত্র রচনাবলী (৪ খণ্ড প্রকাশিত) ।। প্রেমেন্দ্র মিত্র রচনাবলী (২ খণ্ড প্রকাশিত) ।। জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী (২ খণ্ড প্রকাশিত) ।।

প্রতি খণ্ডের মূল্য ৩০ টাকা। তালিকাভূক্ত গ্রাহকদের জন্য বিশেষ সুবিধা রয়েছে।

* বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবণের গবেষণা গ্রন্থ–অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত :
রবীন্দ্র-রচনা সংকলন –
রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা চিন্তা-২৫ টাকা। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য চিন্তা-৩০ টাকা

* রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগত ।। অধ্যাপক সতেন্দ্রনাথ রায় ।। ৩০ টাকা
রবীন্দ্র স্মৃতি ।। বনফুল ।। ১০ টাকা

* অধ্যাপক ড: সরোজমোহন মিত্রের–মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : জীবন ও সাহিত্য ।। ৩০ টাকা
সুকান্তের জীবন ও কাব্য ।। ১৫ টাকা শরৎসাহিত্যে সমাজচেতনা ।। ১৬ টাকা

* উপন্যাস –বনফুল হাটেবাজারে ৮ টাকা ।। গোপালদেবের স্বপ্ন ১০ টাকা ।। অধিক লাল ১০ টাকা ।। ত্রিনয়ন ৮ টাকা ।। গল্পসমগ্র (দুই খণ্ড প্রকাশিত) প্রতি খণ্ড ৩০ টাকা ।। পশ্চাৎপট (আত্মজীবনী) ২৫ টাকা ।।
–বুদ্ধদেব বসু বাসর ঘর ১০ টাকা ।। লাল মেঘ ১০ টাকা ।। কালো হাওয়া ১৫ টাকা ।। এলোমেলো জলতরঙ্গ (ছোটদের উপন্যাস) ১০ টাকা ।।
–প্রতিভা বসু : জন্মান্তর ১০ টাকা ।। যখন বসন্ত ১০ টাকা ।। স্মৃতি সততই সুখের ।। (আমেরিকা ও ইউরোপপের বিচিত্র ভ্রমন কাহিনী–দুই খণ্ডে। প্রতি খণ্ড ২০ টাকা এবং ৩০ টাকা ।।
–জগদীশ গুপ্ত : লঘুগুরু ও অসাধু সিদ্ধার্থ ১০ টাকা ।।
–নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : পদসঞ্চার ১২ টাকা ।।
–শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জনপদবধূ ১২ টাকা ।। কর্ণাটরাগ ৮ টাকা ।। নগরনন্দিনীর রূপকথা ১০ টাকা ।।
–নিরঞ্জন চক্রবর্তী : খেলাঘরের যাত্রী ৮ টাকা ।। প্রতিবিম্বের স্বাদ ৮ টাকা ।।

* কবিতা –অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত : উত্তরায়ণ ১০ টাকা ।। নীল আকাশ ৮ টাকা ।। পূব পশ্চিম ৮ টাকা ।। আজন্ম সুরভী ৮ টাকা ।।
–বুদ্ধদেব বসু শীতের প্রার্থনা-বসন্তের উত্তর ১০ টাকা ।। যে আঁধার আলোর অধিক ৮ টাকা ।। মরচে পড়া পেরেকের গান ৮ টাকা ।।
–জীবনানন্দ দাস : আলো পৃথিবী ১০ টাকা ।।
–মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : সমগ্র কবিতা ১০ টাকা ।।

গ্রন্থালয় প্রা. লি. – ১১এ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট ।। কলিকাতা-৭৩

সূচীপত্র

মরাজি মহল □ বনফুল ১৯

নূপুরের মত □ অনুলিখন অনুপমা দাশ ৩৭

বিষয় ঃ কুলতলি □ অশোক দাসগুপ্ত, তাপস রায়, শুভাসিস মৈত্র ৮

গল্প ঃ লেখকের চিঠি □ সন্তোষ কুমার ঘোষ ৫

বছরে দুবার নির্বাচন □ শংকর ঘোষ ৩৩

শিলিগুড়ির পরিবহন ঃ ভবিষ্যত অন্ধকার □ সুশান্ত আচার্য ৩৪

অনুপ্রবেশ ঃ সীমান্ত জেলা মুর্শিদাবাদে নতুন সংকট □ অসীম কুমার নাথ ৪৩

পুরাতনী ঃ আদালতী হক □ ৩১

গল্প ঃ বাস্তবিক □ অরুণদয় ভট্টাচার্য ২৯

সাংবাদিক হরিশচন্দ্র ও নীল আন্দোলন □ অরুণ মুখোপাধ্যায় ২৩

লাল বাড়ির রহস্য □ কমল ২৮

সাফাই অভিযানের শিকার □ সুদীপ্ত রায় ৩

দূরদর্শন ঃ বাংলা বনাম হিন্দী ছবি □ তপন রায় ২৪

মহার্ঘ ভাতা দাবীর উৎস সন্ধানে □ শংকর ভট্টাচার্য্য ২৫

রাজধানীর কড়চা □ অমৃত রায় ৪১

রাজনীতির নেপথ্যে □ গোবর্ধন মিত্র ৪২

সংবাদ-সাহিত্য □ ৪৭

প্রচ্ছদের ছবি □ ফরাসী মহিলা শিল্পী বেল নোজ কৃত এবং খদ্দি ইন্ডিয়া-র সৌজন্যে প্রাপ্ত

অন্যান্য ছবি □ কবীর আইচ, অলক কুমার মিত্র, প্রবীর দাস

এই সংখ্যায়

কুলতলির জোড়া খুন এবং এস. ইউ. সি. আইর বিধায়ক প্রবোধ পুরকাইত রাতারাতি খবরের কাগজের শিরোনাম হয়ে উঠেছেন। তারই এক সরজমিন তদন্ত প্রকাশ করছি।

পূর্বাঞ্চলের জন্য অতিরিক্ত বিমান মাসুল ০.৩৫ পয়সা
পূর্বাঞ্চল ও কলকাতা বাদে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের জন্য অতিরিক্ত বিমান মাসুল ০.৫০ পয়সা

বনফুল প্রকাশণী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
চিরন্তন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক
কম্প্যু কম্পোজিং অ্যান্ড প্রিন্টিং (ক্যালকাটা)
প্রাইভেট লিমিটেড ৯৬ রাজা রামমোহন সরণি
কলিকাতা-৯ থেকে মুদ্রিত ও ৩২, গণেশ চন্দ্র অ্যাভিনিউ
কলিকাতা-৭০০ ০১৩ থেকে প্রকাশিত।
কার্যালয় ৩২, গণেশ চন্দ্র অ্যাভিনিউ
কলিকাতা-৭০০ ০১৩ ফোন ২৭-৪৯৪৩
দিল্লি অফিস সুনীল ভবন সি ১/১০১-১০২ লাজপত নগর
নয়া দিল্লি-১১০০২৪ ফোন: ৬১৭৬৭১
ত্রিপুরা প্রতিনিধি: গোপাল বসু

শনিবারের চিঠি

(প্রথম প্রকাশ ১৩৩১ বঙ্গাব্দ)
(নব পর্যায়) ১ম বর্ষ ২০শ সংখ্যা
২৫ ফাল্গুন, ১৩৯১ □ ৯ মার্চ, ১৯৮৫

সম্পাদক: চিরন্তন মুখোপাধ্যায়
সম্পাদকীয় উপদেষ্টা: সাহিত্য ● রঞ্জনকুমার দাস; সংবাদ ● অজিত চক্রবর্তী
ব্যবস্থাপক: অরুণাংশু ঘোষ
প্রধান কর্মসচিব: শ্যামলী মুখোপাধ্যায়
অলংকরণ ও অঙ্গসজ্জা: আশিস মুখোপাধ্যায়
মুদ্রণ: শহীদুল ইসলাম

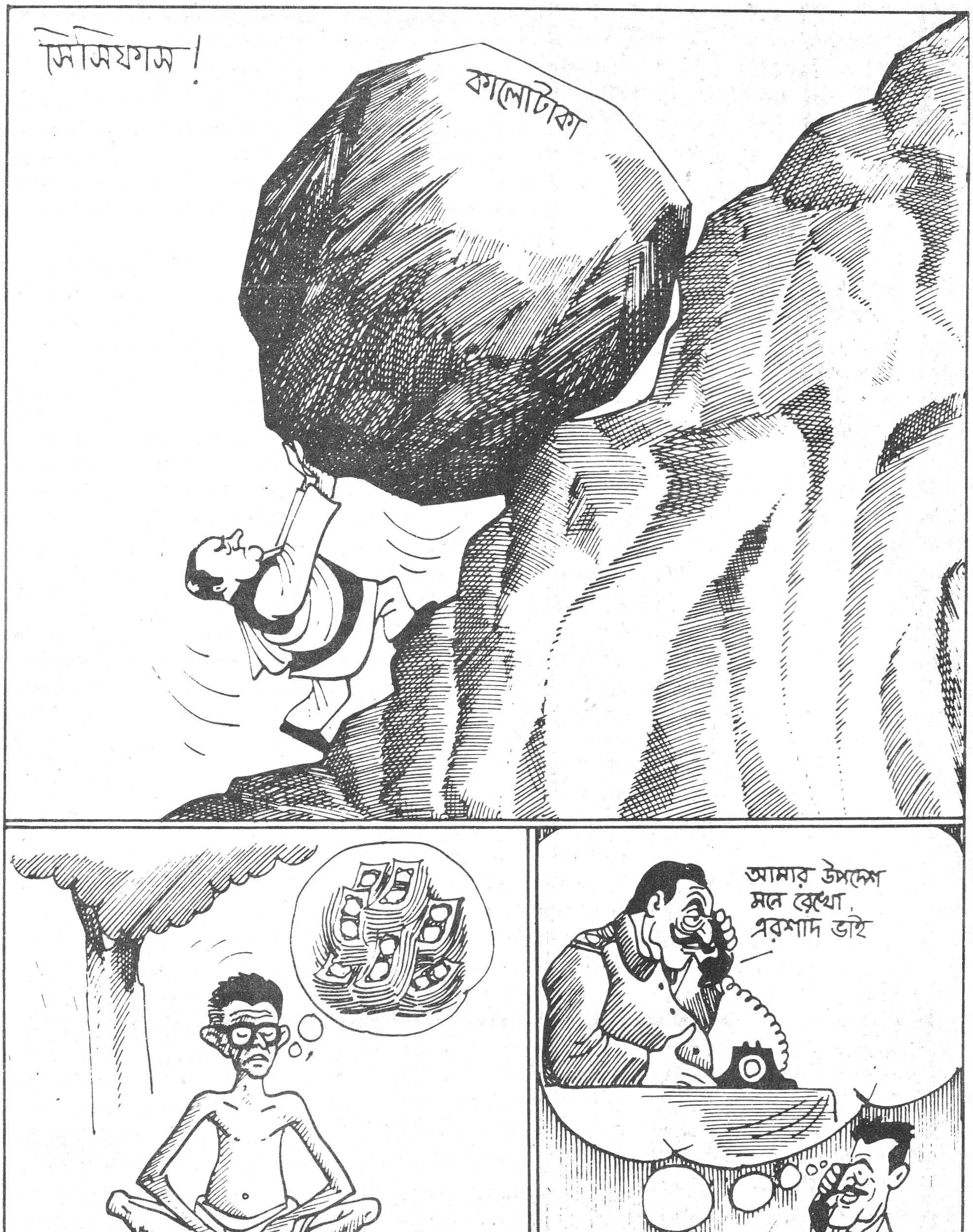
সিসিফাস!
কালোটাকা
আমার উপদেশ
মনে রেখো,
এরশাদ ভাই
পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক অবস্থা

সাফাই অভিযানের শিকার

সুদীপ্ত রায়

ফেব্রুয়ারি মাসের তৃতীয় শনিবারে কসবা থানার অধীনে ইস্টার্ন-মেট্রোপলিটন বাইপাসের রাস্তা তৈরিতে পুলিশি তান্ডব নতুন কিছু নয়। পূর্ব কলকাতার উপনগরী উন্নয়নের নামে ওখানে দীর্ঘ ৩০ বছর যাবৎ বসবাসকারী বাসিন্দাদের সঙ্গে বছর চার আগে আরেকবার মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়েছিল। সেদিন সি এম ডি-এর বেআইনী কাজের প্রতিবাদে এগিয়ে এসেছিলেন মহিলারা। পুলিশ তাঁদের ২৩৫ জনকে গ্রেপ্তার করে। ধৃত মহিলাদের আলিপুর জেলে রাত্রিবাস করতে হয়। সেদিনের ঘটনার নেতৃত্ব দেন অন্তলাল রজকের মেয়ে সীমা দাস।

সাইকেলে চেপে আমরা যখন পৌঁছলাম তখন ঘড়িতে সকাল আটটাও হয়নি। চারদিকের ঘন কুয়াশাতে ৪৯ টি বাড়ি, সি এম ডি-এর অস্থায়ী ক্যাম্প, বুলডোজার, এম্বুলেন্স এবং বিশাল পুলিশ বাহিনীকে ঢেকে রেখেছিল। ভালভাবে কোনো কিছুই দূর থেকে দেখা যাচ্ছিল না। ৪৯ টি বাড়ির মালিক বা ভাড়াটিয়ারা ঘুনাক্ষরেও সেদিন বুঝতে পারে নি যে সাত সকালে ৩৫০ জন পুলিশ ও অফিসারসহ এবং সি এম ডি এ-র কর্তাব্যক্তিরা তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। বাড়িগুলিকে মাটির সঙ্গে গুড়িয়ে দেবে। রাজ্য পুলিস ও সি এম ডি-এ এই অপারেশন শুরু করার আগের দিন রাত থেকেই ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন রাস্তাটির উপরে ক্যাম্প তৈরি করে এবং বিশাল পুলিস বাহিনী ও বুলডোজার এনে রাখে। দু'চার ঘন্টা হাতে সময় পেলেই যাতে অপারেশন সম্পূর্ণ করতে পারেন।

ঘটনাস্থলে পৌঁছে শুনেছিলাম ওই এলাকার লোকসভা কেন্দ্রের সদ্য নির্বাচিত সংসদ সদস্যা মমতা ব্যানার্জী উক্ত স্থানে পৌঁছানোর পর পুলিশ বাহিনী কাজ শুরু করবে। কিন্তু কার্যত দেখা গেল, ৪৯টি বাড়ি ভাঙার মধ্যে সর্বপ্রথম বাড়িটির সামনে কংগ্রেস যারা বাড়ি ভাঙার প্রতিবাদে ওই বাড়ির সম্মুখে সভা করছিল, পুলিশ বাহিনী আচমকা লাঠি এবং ঢাল নিয়ে ওদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। অবশ্য এই অপারেশন শুরু করার আগের দিন রাতে সি এম ডি এ কর্তৃপক্ষ বাড়ির বাসিন্দাদের বাড়ি ভাঙার কথা মুখেমুখে জানিয়ে দেয় বাসিন্দারা নিজেদেরকে তৈরি করারও সময় পায়নি। যদিও সি এম ডি এর ক্যাম্প থেকে ঘটনার দিনে নাগরিক কমিটির একটি সাইক্লোস্টাইল করা প্রচারপত্র বিলি করেছিল। সেই প্রচার পত্রে বলা ছিল—১ থেকে ৩ জন প্রতি পরিবার পিছু প্রকল্প সংশ্লিষ্ট এলাকায় দেড় কাঠা জমি, ৪ থেকে ৫ জন পরিবার পিছু দুই কাঠা জমি এবং ৬ জনের উপরে পরিবার পিছু আড়াই কাঠা জমি দেওয়া হবে ক্ষতিপূরণ হিসেবে। এছাড়া বাড়ির মালিকদের ভাড়া অথবা মালিকানা ভিত্তিতে ফ্ল্যাট দেওয়া হবে। এছাড়াও বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি সাইক্লোস্টাইল প্রচার পত্রে ছিল। কিন্তু উক্ত প্রচার পত্রে কোথাও নাগরিক কমিটির নাম বা সি এম ডি এর কথা উল্লেখ ছিল না। ফলে আইনত প্রচার পত্রটির কোনো মূল্যই ছিল না বলে এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত বাসিন্দারা বলেন।

সি এম ডি-এর এই তুঘলকী মনোভাবের বিরুদ্ধে পূর্ব কলকাতা উপনগরী উন্নয়ন পরিষদের সদস্যারা এবং ক্ষতিগ্রস্থ স্থানীয় বাসিন্দারা মিলিতভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছিল। ঠিক সেই সময় পুলিশ বাহিনী লাঠি চালাতে চালাতে এবং রিভলবার উঁচিয়ে বিক্ষোভকারীদের দিকে ধেয়ে যায়। এবং বাড়ির ভিতরে ঢুকে মহিলাদের লাঠি দিয়ে পেটাতে শুরু করে, বাইরে বের করে আনে। যেমন কুন্তীদেবীর কোলে ৩ বছরের একটি শিশু ছিল। শিশুটির জন্য দুধ গরম

করার জন্য পুলিশের কাছে সময় চেয়েছিল। কিন্তু পুলিশ সেই সময়টুকুও দিতে রাজী হয়নি সেই ছবি তুলতে গেলে আলোকচিত্রীর উপর পুলিশ বাহিনীকে লেলিয়ে দেয় স্বয়ং ডি এস পি সাহেব। এই প্রতিবেদকের সামনেই উক্ত ডি এস পি সাহেব বিক্ষোভকারীদের উপর লাঠি চালানোর জন্য 'চার্জ–চার্জ' বলে চিৎকার করছিলেন। ইতিমধ্যে লাঠির ঘায়ে বেশ কিছু বিক্ষোভকারী মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। তাঁদের এম্বুল্যান্সে করে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করতে হয়। ফলে বিক্ষোভকারী দল পিছু হটে গিয়ে পুলিশের দিকে মাটির ও ইটের টুকরো ছুঁড়ে মারতে আরম্ভ করে। এতে পুলিশ আরো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। এবং এই সুযোগে সি এম ডি এর জনা পঞ্চাশেক লোক হাতের শাবল দিয়ে ঘরের টালিগুলিকে ভেঙে দেয়। এবং কিছুক্ষণ বাদে (ড্রাইভার না থাকায়) বুলডোজারের প্রচন্ড আঘাতে পরপর দু'দুটো বাড়ি ভেঙে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। চারিদিকের বাতাসে তখন একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস।

৪৯ টি বাড়ি ভাঙতে সি এম ডি এর কর্তৃপক্ষ ও পুলিস অভিযান শুরু করেছিলেন, সেই সব বাড়ির মালিকদের দলিল থাকা সত্ত্বেও এবং মিউনিসিপ্যালিটির কর দেবার রসিদ থাকা সত্ত্বেও সেই সব বাসিন্দাদের সঠিক পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করেই হিটলারী কায়দায় রাতারাতি বাড়িগুলোকে ভেঙে দেবার পরিকল্পনা করেন। ফলে যে দু'দুটো বাড়ি সে দিনের অভিযানে বলি হতে হয়েছিল, সে বাড়ির বাসিন্দাদের নগদ ২০১৭ টাকা এবং সোনার কানের দুল, আংটি, এবং গলার হার লোপাট হয়েছে বলে অন্তলাল রজকের মেয়ে শ্রীমতী সীমা দাস অভিযোগ করেন। এছাড়া সর্বপ্রথম বাড়িটার এক ভাড়াটিয়া বৈজুপাশমানের কাসার থালা, ঘটি, এবং নগদ ৩,৫০০ টাকা খোয়া গিয়েছে বলে অভিযোগ করেন। এক পুলিশ–কনস্টেবলকে আলমারি ভেঙে একটা মাটির ভাঁড়ে রাখা এই নগদ টাকা নিতে নাকি উক্ত এলাকার ১০ বছরের একটি ছেলে দেখতে পায়। এবং সে পুলিশকে বলে, 'কী গো তুমি টাকা নিয়ে পালাচ্ছো কেন? এটা তোমার বাপের সম্পত্তি?' ফলে পুলিশটি উত্তেজিত হয়ে ছেলেটিকে লাঠি দিয়ে মারতে মারতে হটিয়ে দেয়। এইভাবে রাজভাঙগা এলাকায় পুলিশ যখন গরীব মানুষদের উপর তান্ডব চালিয়ে যাচ্ছিল, সেই সময় লোকসভার সদস্যা মমতা ব্যানার্জী ঘটনাস্থলে চলে আসায় পুলিশ আর বেশিদূর এগোতে সাহস পায়নি। তবে সি এম ডি এ কর্তৃপক্ষ ও পুলিশ বাহিনীকে সাময়িকভাবে সেদিন পিছু হটতে বাধ্য হলেও, সময় সুযোগ মতো পুনরায় বাসিন্দাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়ে গেল।

অভিযান শুরু করার আগে এই প্রতিবেদকের কাছে সি এম ডি এর ডেপুটি ডিরেক্টর শ্রীশ্যামল বসু বলেছিলেন, রাস্তাটির উপর থেকে বাসিন্দাদের উচ্ছেদের নোটিশ ১৯৭৮ সালের জুলাই মাসেই দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বেশ কিছু বাসিন্দারা নাকি কোনো নোটিশ পায়নি বলে অভিযোগ করেন। সেই অভিযোগকারীদের মধ্যে সুধীর মজুমদার সতীশ চন্দ্র দে (দাগ নং ২৬৫৮) সন্ধ্যা দেবনাথ এবং চিনুবালা বিশ্বাস, কৃষ্ণ চন্দ্র দে (দাগ নং ২৬০৯) প্রমুখরা। রাস্তা তৈরি এবং এলাকার উন্নয়ন হোক সেটা সব বাসিন্দারা চান। কিন্তু এভাবে নয়। সুষ্ঠু পুনর্বাসনের মাধ্যমে। □

লেখকের চিঠি

সন্তোষকুমার ঘোষ

সম্পাদক মহাশয়

মাননীয়েষু,

সবিনয় নিবেদন, মাস কয়েক হ'ল ডাকযোগে একটি গল্প পাঠিয়েছিলুম। সেটি মনোনীত হয়েছে ব'লে খবরও দিয়েছিলেন। তারপর অনেক দিন কেটে গেল, লেখাটি এ সংখ্যাতেও ছাপা হয় নি দেখলুম।

যাই হোক, আমার তাগাদা সেজন্যে নয়। ছাপা হয় নি, সেটা বরং শাপে বর। গল্পটি যদি ছাপাখানায় না পাঠিয়ে থাকেন তবে আমাকে ফেরত পাঠালে বাধিত হব। কেননা শেষের দিকটা ফিরে লিখতে হবে। ছাপা হয়ে গিয়ে থাকলে ফর্মার শেষ পৃষ্ঠাটা নষ্ট ক'রে ফেলুন।

এই অসঙ্গত আবদারে আপনি, অনুমান করি, বিব্রত বোধ করছেন। আমার কথা রাখতে গেলে কিছু আর্থিক লোকসান তো হবেই, কাগজ প্রকাশের দিনটিও পিছিয়ে যেতে পারে। বিশ্বাস করুন, নেহাত দায়ে না ঠেকলে এমন অন্যায় প্রস্তাব করতুম না।

গল্পটি আগাগোড়া বানানো হ'লে কোন কথা ছিল না। ঠেকে গেছি সত্য ঘটনাকে সাহিত্য করতে গিয়ে। এ কাজে আমার বন্ধু কল্যাণবাবু নিপুণ, চেনা লোককে নিয়ে লেখার অভ্যাস তাঁকে সুনাম দুর্নাম দুই-ই দিয়েছে। জানতাম যার কর্ম তারে সাজে, তাই মাঝে মাঝে লোভ হ'লেও কখনও তাঁর পথ ধরি নি।

কিন্তু দেখুন তো, নীতিবাক্যটি ভুলে গিয়ে কি বিপদেই পড়েছি! আর ভুলেছিলুম তো ভুলেছিলুম, হতভাগা লোকটার সঙ্গে ফের দেখা হতে গেল কেন! লেখাটা একবার ছাপা হয়ে গেলে আর চারা ছিল না। ওকে বোঝাতে পারতুম, হাতের ঢিল একবার ফস্‌কে গেলে, ইত্যাদি।

ঠিক ক'রে বলুন তো, লেখাটা আপনি পড়েছিলেন কি না! চেনা লেখক, আমার ধারণা, নাম দেখেই ওটা মনোনীত মার্কা ফাইলে তুলে রেখেছেন, সুবিধামত ছাপবেন ভাবছেন। কোথায় অসুবিধে ঘটেছে আপনাকে খুলে বলি। ফাইল থেকে রচনাটি যদি বের ক'রে সামনে নিয়ে বসতেন, সব চেয়ে ভাল হ'ত। যাই হোক, গল্পটি ফের সংক্ষেপে লিখে দিচ্ছি, চোখ বুলিয়ে গেলেই বুঝবেন, কোন্‌খানটা বদলাতে চাই এবং কেন।

আগেই কবুল করেছি, এটা আমার দেখা গল্প। অধুনা যেখানে আছি সেটা যদিও প্রবাস, তবু এর পাত্রপাত্রী বাঙালী, কারণ আমার বাসা আসলে একটা বাঙালী ব্যারাকে। ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে, বাঙালী লেখক প্রবাসেও স্বজন নিয়ে কাহিনী বোনে।

এই প্রবাসে চমকপ্রদ কিছু ঘটে না, বা ঘটলেও আমার চোখে পড়ে না। খোঁড়া পা'র মত দিনগুলোকে কোন মতে টেনে টেনে চলি। তাই প্রতিবেশী সুধীরবাবুর বদলি হয়ে যাওয়ার মত সামান্য ব্যাপার নিয়েও এখানে কম আলোচনা হয় নি। প্রথমে আলোচনা, পরে কানাকানি হাসাহাসি। আমার গল্পের গোড়ার দিকে এ সবের সবিস্তার বর্ণনা আছে। কৌতূহল হ'লে অংশটুকু প'ড়ে নেবেন।

কিন্তু অতকষ্ট কেনই বা করবেন? গল্পটির মোটামুটি কাঠামো ফের তো লিখতেই বসেছি। সুধীরবাবু মধ্যবয়সী, জীবনে দু কুড়ির ওপর কোন্ না ছ-সাতটি বসন্ত দেখেছেন। কিন্তু সুদর্শন। বিশেষণটি মনে রাখবেন। দীর্ঘ পাতলা দেহ, পাক-ধরা চুল এখনও রীতিমত ঘন, টেরিযোগ্য, বেশবাসে অসামান্য রুচি। খুব কম প্রৌঢ়ের চোখে মুখে এতটা শ্রী দেখেছি। সাহিত্য সঙ্গীত ইত্যাদিতেও অনুরাগ আছে। তরুণ বয়সে কিঞ্চিৎ কাব্য চর্চাও করতেন মনে হয়।

গল্পের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখবেন, সুধীরবাবুর স্ত্রীকে মাত্র রূপবতী বলেছি। সংযমের কারণ নেহাত ব্যক্তিগত। বলা যায় না, ছাপা হ'লে আমার গৃহিণী লেখাটা পড়তেও পারতেন। পরস্ত্রী নিয়ে সাত কাহন লিখতে ভরসা পাই নি। এ চিঠি গোপনে আপনাকে লিখছি, তাই জানাতে বাধা নেই, উল্লিখিত মহিলা গৌরাঙ্গী, সুকেশা, তিলফুল নাসা। দেহের গড়নও ভাল, তবে ঝোঁক ঈষৎ পৃথুলতার দিকে। এবার আপনি যা জানতে চাইবেন জানি, -- ভদ্রমহিলার বয়স। সুধীরবাবুর বয়সটা অনায়াসে লিখতে পেরেছি, তাঁর স্ত্রীরটা পারব না। মেয়েদের ও-বস্তুটি, জানেন তো, অনেক প্রলেপের লেপমুড়ি দিয়ে থাকে। প্রথম দেখে আমার মনে হয়েছিল, শী ইজ থার্টি ইফ এ ডে; আমার স্ত্রী বলেছিলেন চল্লিশ; সুতরাং গড়পড়তার অঙ্ক ফেলে ধ'রে নিতে পারেন পঁয়ত্রিশ। তা ছাড়া পরে জেনেছি, ওঁর বড় মেয়েটি কিশোরী; আরও পরে, ওঁর এক পাটি দাঁত বাঁধানো। অবশ্য বয়সের বিচারে এসব কিছুই প্রমাণ করে না। ধ'রে নিতে পারেন, এটা সেই ভাটা লাগার কাল, যখন গ্ল্যামার হয়তো কিছুটা থাকে, কিন্তু নবীনতা আদৌ না। পুরুষের এ বয়সে দরকার হয় চশমা এবং হজমী গুলির, মেয়েদের ঘড়ি ঘড়ি প্রসাধনের ঝুলির।

বাজে কথা ঢের হ'ল, এবার আসল গল্পে ফিরে আসি।

বদলি হয়ে সুধীরবাবু বিশেষ অসুবিধেয় পড়েছিলেন। যেখানে ওঁকে পাঠানো হ'ল, সেখানে সস্তায় বাসা ভাড়া পাওয়া যায় না। ছেলেমেয়েরা এখানে পড়ছে, সেশনের মাঝামাঝি, লটবহর তুলে পালানো কি সোজা! অগত্যা ঠিক হ'ল, সুধীরবাবু নতুন জায়গায় একাই যাবেন, হোটেলে থেকে চাকরি করবেন। সমস্যা তাতেও কম নয়, কেন না, আয় সামান্য, দু জায়গার খরচ পোষানো এক রকম অসম্ভব। তবু যেতে হ'ল। আমাদের উপর অনুরোধ রইল, অভিভাবকহীন পরিবারটির দিকে যেন নজর রাখি।

মুশকিলে পড়লুম এই নজর রাখতে গিয়ে। নইলে অজ্ঞাতকুলশীল কে এক পরিমলবাবু কোথায় এসে উঠেছেন, কী করছেন, এত খবর আমার জানবার কথা নয়।

আমার স্ত্রী একদিন বললেন, মৃণালদির ভাবনা ঘুচল।

গল্পটি পড়া থাকলে আপনাকে ব'লে দিতে হ'ত না, মৃণাল সুধীরবাবুর স্ত্রীর নাম। শুনলুম, সুধীরবাবুর বাসায় অতিথি এসেছেন। ওঁদেরই পুরনো বন্ধু, বড় চাকুরে, পরিমলবাবু নানা দেশ ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ এখানে এসে পড়েছেন। পরিমলবাবুর মা এবং গৃহিণীও কাছাকাছি কোন এক তীর্থে আছেন, তাঁরাও এসে পড়লেন ব'লে। তারপর সবাই মিলে একসঙ্গে কলকাতা যাবেন।

জিজ্ঞাসা করলুম, সবাই যাবে কেন?

বারে, পরিমলবাবুকে মৃণালদি ওঁদের অসুবিধার কথা সব খুলে বলেছেন যে। সুধীরবাবুর যা আয় তাতে দু জায়গায় খরচ কুলোয় না শুনে পরিমলবাবু বলেছেন, কলকাতায় ওঁর একটা বাসা একরকম খালি প'ড়ে আছে, সেখানে বিনা ভাড়ায় এরা থাকতে পারবে। মিড সেশনে ছেলেমেয়েদের ট্রান্সফারেরও কোন অসুবিধা হবে না, সে ব্যবস্থা পরিমলবাবুই করবেন। সম্পাদক মশায়, এক দিনে আমার স্ত্রী কত খবর সংগ্রহ করেছেন দেখুন, সাধে কি ইনটেলিজেন্স সার্ভিসে মেয়েদের এত কদর! সব শুনে পরিমলবাবুকে বিধিপ্রেরিত পুরুষ

ব'লে মনে হয়েছিল।

জিজ্ঞাসা করলুম, ওঁরা কবে যাবেন?

মৃণালদি বলেছেন, সপ্তাহখানেক। কলকাতার খালি বাসাটার কলি ফেরাতে হবে। এর মধ্যে ওঁরা সকলে একবার সুধীরবাবুর সঙ্গে দেখা ক'রে আসবেন। সুধীরবাবুর ছুটি নেই, নিজে আসতে পারবেন না।

স্ত্রী বললেন, তোমার কি মনে হয়।

সম্রাট মহানুভব।

স্ত্রী বললেন, এতদিনে মৃণালদির মুখে হাসি ফুটেছে। জান, এ কদিন উনি শুধু লুকিয়ে লুকিয়ে কেঁদেছেন?

বললুম, কী করে জানব? জানলেও তোমার কাছে সে কথা কি কবুল করতে ভরসা পেতুম?

স্ত্রী কটাক্ষ হেনে (এখনও মাঝে মাঝে হানেন) বললেন, তোমার সবটাতেই ইয়ার্কি। ওঁরা সত্যি খুব বেঁচে গেলেন, না? এই দুর্দিনে বাসা ভাড়া বেঁচে যাওয়া, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার বন্দোবস্ত --

ক্রমে ক্রমে পরিমলবাবুর আরও নানা গুণের কথা কানে এল। আমার সূত্র অবশ্য ওই একটিই। শুনলুম, সম্রাট শুধু মহানুভব নন, সম্রাট কবিও। মুখে মুখে ছড়া তৈরী করেন। প্রশ্ন করেছিলুম, যথা?

মৃণালদি ওঁর বউদি তো, ঠাট্টার সম্পর্ক। এই তো সেদিন শুনলুম, ওঁকে ডাকছেন 'যেমন আছ তেমনি এসো আর ক'রো না সাজ..... বেণী না হয় এলিয়ে রবে, সিঁথি না হয় বাঁকা হবে.....' আরও কত কী!

চমকে বললুম, এ তো রবীন্দ্রনাথের কবিতা।

স্ত্রীও কিছু অপ্রতিভ হলেন। -- তাই নাকি? তবে যে মৃণালদি বললেন, উনি নিজেই কবিতা বানান!

বললুম, আমার কোন ভাই বানিয়েও তোমাকে এ ভাষায় ডাকলে আমি কিন্তু খুশী হতুম না।

চ'টে গিয়ে স্ত্রী বললেন, যাচ্ছেতাই সব লিখে লিখে তোমার মনটাই খারাপ হয়ে গেছে। কবি না হোন ভদ্রলোক খুব রসিক। তোমার মত সব সময় মুখ হাঁড়ি ক'রে ব'সে থাকেন না। মৃণালদি যখন রান্না করেন, উনি তখন পাশে মোড়া নিয়ে ব'সে মজার মজার সব গল্প বলেন, জান?

জানি, সম্পাদক মশাই, এই অবধি প'ড়ে আপনি মুখ টিপে হাসছেন, মনে মনে বলছেন, বুঝেছি। আসল মুশকিল কোথায় জানেন? গল্প-উপন্যাসে একটা জিনিস যত সহজে বোঝা যায়, প্রকৃত জীবনে যায় না। ডিটেকটিভ বইয়ের গোয়েন্দা কত সহজে খুনীকে ধ'রে ফেলেন, অথচ সত্যিকার পুলিস সামান্য একটা চুরির কিনারা করতে হিমসিম খেয়ে যায়। অনেক গল্প-বাছাই — করা আপনার অভিজ্ঞ চোখ, অনেক – গল্প-পড়া আমার পাঠকের মন যত চট ক'রে ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছে, আমরা প্রত্যক্ষদর্শীরা কিন্তু তত তাড়াতাড়ি পারি নি। এমন কি পরিমলবাবু আর মৃণাল দেবীকে একদিন সিনেমাতে একসঙ্গে দেখেও নয়।

ইন্টারভ্যালের সময় আমার স্ত্রীই আঙুল দিয়ে দেখালেন, ওই দেখ।

ঘাড় ফিরিয়ে দেখলুম, আমাদের কয়েক সারি পিছনে, কিছু বেশী দামের আসনে, ওরা দুজনে। পরিমলবাবু আর মৃণাল। কী ভুল দেখুন, পরিমলবাবুর বর্ণনা দিতেই মনে নেই। অবশ্য মূল গল্পের দশম পৃষ্ঠায় এ নিয়ে পুরো একটি প্যারা আছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে লোকটি ময়লা, মোটাসোটা, মজবুত ধরনের।

স্ত্রীকে বললুম, যাও আলাপ ক'রে এস গিয়ে।

ও জোরে মাথা ঝাঁকুনি দিলে -- না, ছি ছি, লজ্জাও করে না। স্বামী বিদেশে হোটেলে খেয়ে না খেয়ে ওদের জন্যে খেটে মরছে, আর উনি সিনেমা দেখতে এসেছেন!

একটু পরে পরিমলবাবুকে দেখতে পেলুম না। সিগারেট খেতে বাইরে গিয়ে থাকবেন। মৃণাল আমার স্ত্রীকে হাতছানি দিয়ে একবার ডাকলে। আমার স্ত্রী যেন দেখেও দেখলে না। আমি ওর কানের কাছে মুখ নামিয়ে বললুম, ছিছি, না হয় ওরা একটু বেশী দামের সীটেই এসেছে। তাইতে এত চ'টে গেলে?

স্ত্রী আরও চ'টে গিয়ে বললেন, তাইতে বুঝি? ওদের রকম দেখে। পাঁচজনে পাঁচরকম কথা বলতে শুরু করেছে, জান?

বললুম, অন্তত এক জনেরটা তো জানছি।

রাগ ক'রে আমার স্ত্রী ছবিতে মন দিলেন।

আরও একচোট নিলেন বাড়ি ফেরার পথে। -- তোমাকে এতদিন বলি নি। কী বেহায়া জান, লোকটা ওকে একটা শাড়ি কিনে দিয়েছে, আমাদের দেখাতে এসেছিল।

শুধু ওকে?

না, ছেলেমেয়েদেরও অবিশ্যি একসেট ক'রে নতুন জামাকাপড় দিয়েছে। ওটা লোক-দেখানো। রোজ ডিম আসছে, ফল আসছে, মাংস দিয়ে দশ রকমের রান্না হচ্ছে। মুখেও রোচে! ওদিকে সেই বেচারা বিদেশের হোটেলে উপোস দিচ্ছে কি-না ঠিক নেই।

বললুম, সাবিত্রী, সকলের পাতিব্রত্যের আদর্শ হয়তো তোমার মত উঁচু নয়।

স্ত্রী বললে, ঘেন্না। ওর সাজগোজের ঘটা আজকাল কত বেড়ে গেছে দেখতে পাও না?

নিরীহ গলায় জবাব দিলুম, কী করে পাব। তোমার ভয়ে ভাল ক'রে তাকাই না তো।

পরদিন সকালে হঠাৎ ও-বাড়ি থেকে সহর্ষ আবৃত্তি শুনতে পেলুম,.... কোন্ দেব আজি আনিলে দিবা! তোমার পরশ অমৃতসরস, নয়নে তোমার দিব্য বিভা --

স্ত্রী বললে, শুনলে?

ব্যাপার কী?

ঘুম ভাঙিয়ে মৃণালদি চা খাওয়াতে গেছে যে। তাই কবিত্বের বান ছুটেছে।

হেসে বললুম, এ কবিতাটাও কিন্তু ওর রচনা নয়।

না হোক। পরের বউকে পরের লেখা কবিতাই বা শোনাতে যাবে কেন শুনি?

বললুম, ঠিক। এই তো তোমার ঠোঁটের তিলটি দেখে কতদিন বলেছি -- ধারা নিবন্ধেব কলঙ্করেখা, সেও অন্যের রচনা, কিন্তু পরের লেখা নিজের বউকে শোনানোতে বোধ হয় দোষ নেই, না?

স্ত্রী রসিকতাটায় কর্ণপাতও করলেন না। নিজের ঝোঁকেই ব'লে গেলেন, মরি মরি রুচি! অমন দেবতুল্য সুন্দর যার স্বামী, সে কিনা কদাকার একটা লোকের সঙ্গে -- ছিঃ!

অর্থাৎ লোকটা কন্দর্পকান্তি হলে তোমার আপত্তি হ'ত না?

ভারি তার্কিক হয়েছ! আসল কথা, সব কিছুরই বয়স আছে। বড় বড় ছেলে, দুদিন বাদে মেয়ের বিয়ে দিতে হবে, তার কি এসব সাজে!

এসব যে খুব উঁচুদরের নীতিকথা নয়, শ্রীমতীকে সেটা বলতে ভরসা হ'ল না।

মূল গল্পে, সম্পাদক মশাই, এই পর্যন্ত পৌঁছাতে আমার বিশ পৃষ্ঠা লেগেছে। অতঃপর আমার সঙ্গে পরিমলবাবুর পরিচয়ও হয়েছিল, তখনকার আলাপ-আলোচনা, এখানকার ক্রমোচ্চ কানাকানি, আরও সব ছোটখাটো খুঁটিনাটি চিঠিতে বাহুল্যবোধে বর্জন করলুম।

এখানে কেউ কেউ, মহিলারাই বেশী, বলতে শুরু করেছিলেন, লোকটার মা আর স্ত্রী এখানে আসবার কথা ছিল, তাদের কী হ'ল? পুরুষেরা ভাবছিলেন, লোকটার ছুটি আর ফুরোয় না নাকি! কলেজের এমন কি হাইকোর্টের ছুটিরও তো শেষ আছে।

শেষ পর্যন্ত একদিন শোনা গেল ওদের যাবার দিন ঠিক হয়ে গেছে। আগামী কাল ওরা সবাই গিয়ে সুধীরবাবুর সঙ্গে দেখা ক'রে আসবে। ফিরে এসে কলকাতা। ওরা যেদিন গেল, তার পরদিনই যদি সুধীরবাবু এখানে হঠাৎ চ'লে না আসতেন তবে হয়তো ব্যাপারটা এমন হাটে-হাঁড়ি হয়ে যেত না। অফিসে কি কাজ পড়েছিল, সুধীরবাবু তাই এক দিনের জন্যে এখানে এসেছিলেন। আমরা পরে অনুমান করেছিলাম, ওটা ছুতো। ওঁর কানেও কিছু কানাঘুষো পৌঁছে থাকবে। এসে জিজ্ঞাসা করলেন, ওরা কই? শুনলেন, সে কি, ওরা যে আপনার ওখানে।

কবে গেল?

কেন, কাল।

সুধীরবাবু ওখানেই, মাটির উপরেই বসে পড়লেন। কেউ কেউ বললে, সে কি মশায়, শুনলাম আপনার অনেক দিনের বন্ধু।

কে বললে বন্ধু! উনি এখন যেখানে থাকেন, লোকটার সঙ্গে আলাপ সেখানেই। দু দিনেই অবশ্য খাতির জমেছিল। এখানে বেড়াতে আসবে শুনে সুধীরবাবু নিজেই ওকে ওঁর বাসার ঠিকানা দিয়েছিলেন। ওর মারফৎ স্ত্রীকেও একটা চিঠি পাঠিয়েছিলেন, লোকটার আপ্যায়নের যেন ত্রুটি না হয়।

সুধীরবাবু পরেরগাড়িতে ফিরে গেলেন। সৌম্য প্রৌঢ় ভদ্রলোকটিকে সেদিন অত্যন্ত করুণ দেখাচ্ছিল।

মৃণালরা কিন্তু ফিরে এসেছিল। ঠিক সাত দিন পরে। মেয়েরা গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, একেবারে ভালমানুষের মত গলায়, সুধীরবাবু কেমন আছেন মৃণালদি?

ভাল না ভাই। খুব রোগা হয়ে গেছেন। ছুটি নেই, নইলে নিজেই আসতেন।

কেউ চোখ টিপল, ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসল কেউ। -- এ কদিন ওখানেই ছিলেন বুঝি?

মৃণালদি নাকি ঘাড় নেড়ে সায় দিয়েছিলেন। ফস ক'রে কে তখন জিজ্ঞাসা ক'রে বসল, তবে যে শুনলুম আপনারা নৈনিতালে গিয়েছিলেন! এখানকার নিতাইও ঘুরে এল কিনা, সে বললে আপনাদের ওখানে দেখেছে।

এটা আন্দাজী ঢিল, কিন্তু লেগেছিল ঠিক। আমার স্ত্রীর কাছে শুনেছি, মৃণালের মুখ পলকে সাদা হয়ে গিয়েছিল। কোন রকমে নিজেকে সামলে বলেছিল, আমি এখন একবার গা ধুতে যাব ভাই, সারারাত ট্রেনে এসে মাথা ঘুরছে।

বেশী লোক জানাজানির ভয়ে লোকটাকে আর মারধোর করলুম না। পাড়ার মুরুব্বীরা ওকে আড়ালে ডেকে ধমকালেন। সেদিন দুপুরেই পরিমল চম্পট দিলে। সুধীরবাবুকে তার ক'রে দেওয়া হ'ল, পরদিনই ভোরে এসে যেন ওদের এখান থেকে নিয়ে যান।

সন্ধ্যার দিকে ও-বাড়ি থেকে মৃদু কান্নার আভাস পেলুম।

স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলুম, আবার কী হল।

তিনি মুখ ঘুরিয়ে বললেন, থিয়েটার। মৃণালদি খালি কাঁদছে আর মূর্ছা যাচ্ছে।

সে কি, কেন? পরিমলের শোকে নাকি?

শুনলুম পরিমলের শোকে নয়, গয়নার। লোকটা নাকি যাবার আগে বাক্স ভেঙে সব নিয়ে গেছে।

কপট সহানুভূতির সুরে বললুম, আহা, তবে তো শোক হতেই পারে। গয়নার চেয়ে মেয়েদের কাছে বড় কী আছে! গহনাৎ পরতরং নহি।

নয়নে অগ্নিবাণ হেনে স্ত্রী বললেন, চুপ কর। মেয়েদের তো সব কিছু জেনে ব'সে আছ! ওর গয়না চুরি গেছে না ছাই! নিজে থেকে সব একখানা একখানা ক'রে তুলে দিয়েছে, নইলে এত সিনেমা আর হিল ইস্টিসনের খরচ এল কোথা থেকে! আর সব গয়না যাই হোক, অন্তত একটা যে চুরি যায় নি আমি দিব্যি গেলে বলতে পারি। বলতে বলতে স্ত্রী চাপা গলায় বললেন, জান, মৃণালদির হাতের আংটিটা নেই?

সভয়ে বললুম, ওরে বাবা, এত দূর?

নৈনিতালে সাত দিন কাটিয়ে এল, আরও কতদূরে গড়িয়েছে কে জানে?

বোকার মত বললুম, এখন কাঁদে কেন?

এটুকুও বোঝ না, কি বুদ্ধিতে তবে গল্প লেখ! কাঁদে ভয়ে। একজন তো পালিয়েছে, আর একজনের কাছে মুখ দেখাতে হবে না? বাকি জীবনটা যাকে নিয়ে ঘর করতে হবে, তাকে বোঝাবে কি দিয়ে? তাই এখন নিজে সাধু সেজে লোকটাকে চোর অপবাদ দিচ্ছে।

আমার আসল গল্প, সম্পাদক মশাই, এইটুকু। যে লেখাটা পাঠিয়েছি তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখবেন, ঘটনা প্রায় সবটাই মেলে। কিন্তু তলিয়ে দেখলে বুঝবেন, গরমিলও অনেকখানি। সে তফাত সুরের। আমরা, একালের কথাকারেরা, শুধু গল্প ব'লে তো খুশি নই, সবজান্তাও হতে চাই। মনোবিকলনের দিকে ঝুঁকে পড়ি। আমাদের নিজেদের সিদ্ধান্ত চরিত্রের উপর আরোপ করি। মন দিয়ে পড়ুন, দেখবেন, এ ভুল আমি এ গল্পেও করেছি। মৃণালের সঙ্গে পরিমলের ঘনিষ্ঠতা ঘটেছিল, শুধু এটুকু লিখেই ক্ষান্ত হই নি, সেই সঙ্গে বলতে গেছি, কেন। মৃণাল, অমন সুরূপ শান্ত সৌম্য যার স্বামী, পরিমলের মধ্যে কী দেখে ভুলেছিল। উত্তরের খোঁজে তাকিয়েছি পরিমলের কম বয়সী মজবুত শরীরটার দিকে, সবচেয়ে সোজা এবং স্থূল যে সমাধান মনে এসেছে, সেটাই বিনা বিচারে লিখে দিয়েছি। বলতে চেয়েছি, পুরুষের প্রতি অন্ধ আদিম আকর্ষণ ছাড়া মৃণালের ক্ষণিক বিভ্রমের আর কোন হেতু নেই।

গোটা গল্পটাই ওখানে মিথ্যা হয়ে গেছে।

সেদিন কাছাকাছি একটা শহরে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ পরিমলের মুখোমুখি প'ড়ে গেলুম। দেখামাত্র চিনলুম, সেও আমাকে চিনল, আর আশ্চর্য, সে পালাতে চেষ্টাও করলে না। বললুম, ভয় নেই, আমি পুলিসে খবর দেব না। সে বললে, জানি। এবং আমাকে অবাক ক'রে বললে, চা খাবেন? বিনা বাক্যে ওকে অনুসরণ করলুম।

ছোট দোকান, কোন মতে এক ধারে দুজনের মত জায়গা পাওয়া গেল।

ভূমিকা না বাড়িয়ে প্রথমেই বললুম, পরিমলবাবু, আমার গোটা কয়েক কথা জিজ্ঞাসা করার ছিল।

দেবতা যেমন বর দেন সেই সুরে সে বললে, করুন।

বললুম, আমি একটা ব্যাপার ভাল বুঝতে পারি নি।

তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে হাত ঘুরিয়ে পরিমল বললে, দু দিনের ব্যাপার, ও-সব যেতে দিন।

গম্ভীর গলায় বললুম, দু দিনের ব্যাপার জানি। কিন্তু সেটাই বা কেন ঘটেছিল তাই বুঝতে পারি নি। মৃণালের তো কিছুর অভাব ছিল না।

পরিমল লঘু গলায় হেসে উঠল। -- অর্থাৎ আদর্শ উদার স্বামী ইত্যাদি ছিল বলবেন তো? তার পাশে আমি নিছক একটা পশু, না?

বললুম, শুধু উদার নন, সুধীরবাবু ওকে ভালও বাসতেন।

ওখানেই আপনার একটু ভুল হ'ল। পনেরো-কুড়ি বছরের বিবাহিত জীবনের পর কতটুকু প্রেম বাঁচে বলুন তো? কজন স্বামীর চোখে প্রথম দিনের সেই মোহ থাকে?

বাধা দিয়ে বললুম, তবে তো আমি যা ভেবেছি তাই। এ নিতান্ত জৈব ব্যাপার। আপনি বয়সে তরুণ ব'লেই জিতেছিলেন।

পরিমল আবার হাসল। -- ফের ভুল হ'ল। জিতেছিলুম আমি নিজে তরুণ ব'লে নয়, ওকে তরুণী ভেবেছিলুম ব'লে।

শূন্য চোখে চেয়ে বললুম, বুঝতে পারলুম না।

পারলেন না? পরিমল গলা নামিয়ে বললে, মৃণালের বয়স কত জানেন? জানলে পারতেন।

• পরবর্তী অংশ ১৮ নং পৃষ্ঠায়

কুলতলি

জোড়া খুন : সরেজমিন তদন্ত

তাপস রায়

পশ্চিমবাংলার চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্গত বিস্তীর্ণ সুন্দরবন অঞ্চলের কুলতলি থানার এক্তিয়ারে ছোট্ট একটি গ্রাম। নাম রাধাবল্লভপুর। কুলতলি বা রাধাবল্লভপুরের নাম নিয়ে এই প্রথম হইচই হল।

সেখানে প্রশাসনের হাত সহজে পৌঁছায় না, পুলিশের গাড়ি বা পুলিস কর্মীদের পৌঁছানো অসাধ্য। কুলতুলি তেমন একটি গ্রাম। ১৫ জানুয়ারির ঘটনায় কুলতলি বা রাধাবল্লভপুর সম্বন্ধে সাধারণ মানুষ কৌতুহলই শুধু নয়, পুংখানুপুংখভাবে ঘটনা জানার জন্য আগ্রহী।

৪ ফেব্রুয়ারি সোমবার ঘটনার ১৯ দিন পর :

কলকাতা থেকে গাড়িতে রওনা হলাম। গন্তব্যস্থল কুলতলি; গাড়ি ছুটে চলল। পৌঁছালাম জয়নগর। সেখান থেকে অল্প কিছুক্ষণ পর আটেশ্বরতলা। এরপর আর গাড়ি যাবার পথ নেই। শুরু হল হাঁটা। আধ কি.মি. পথ হাঁটার পর সামনে এলো ছোট্ট একটি নদী। মন্দীভুত স্রোত, নাম মণি নদী। ছোট্ট ডিঙিগ নৌকায় উঠলাম, এপার থেকে ওপারে যাওয়ার জন্য মণির তট তলায়। এখানকার বি.ডি ও অফিস জয়নগরে, থানা--জামতলাহাট।

এই মণি নদী অপরাধীদের অত্যন্ত উপকারী বন্ধু। এপারে অপরাধ করে অন্য পারে চলে যেতে সুন্দর ভাবে সাহায্য করে।

শুরু হল মণি তটতলা থেকে সেই অভিশপ্ত জায়গা রাধাবল্লভপুরের দিকে হাঁটা। উঁচু-নীচু আলের উপর দিয়ে ধান কাটা জমির মাঝ বরাবর রাস্তা বের করে পথ কম করার চেষ্টা। ভীত এবং সন্ত্রস্ত মানুষের দৃষ্টি এবং জিজ্ঞাসা--"বাবু কে?" অনেক মানুষ সামনে হেঁটে পথ দেখাতে দেখাতে এবং করুণ কাহিনী সে যা দেখেছে এবং শুনেছে, বলতে-বলতে হেঁটে চলল। সামনে একটা হাট পড়ল। নাম জিজ্ঞেস করলাম। বলল সিকির হাট বসে সোমবার ও শুক্রবার।

হাঁটা চলল। প্রায় ১০/১১ কি.মি. পথ হাঁটার পর রাধাবল্লভপুর গ্রামে এসে পড়লাম। দূরে একটা ভগ্ন, জীর্ণ একটা বাড়ি। লোকেরা বলল--বাবু, ঐ যে বাড়িটা দেখছেন, এটা ডাঃ শ্রীনিবাস বাবুর বাড়ি। ঐ বাড়ি থেকেই মর্মান্তিক ঘটনার সূচনা এবং ওখান থেকেই সবচেয়ে বেশি ভোটে বিজয়ী কংগ্রেস (ই) যুবকংগ্রেস কর্মী, পঞ্চায়েত সদস্য মহঃ আবদুর রহমান লস্কর(বয়স ২৪/২৫) এবং কংগ্রেস কর্মী আবদার মোল্লা (বয়স ৪৫/৪৬)কে নিয়ে গিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়।

বললাম, চলো তোমাদের ডাক্তারবাবুর বাড়ি। বাড়িতে ঢুকলাম চারিদিকে মাঠ। বিচ্ছিন্ন জায়গায় এই ডাক্তার বাবুর বাস। চারিদিকে জিনিষপত্র ভাংগা চোরা চালের

খড় এদিক সেদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। ঘরে জিনিসপত্র বলতে কিছু নেই। মনে হবে বাড়ির উপর দিয়ে একটা ঘুর্ণিঝড় বয়ে গেছে। বললাম ডাক্তারবাবু কে? বছর ৪৫/৪৬ বয়সের মাঝারি গড়নের একটা মানুষ, খালি গায়ে রিলিফের দেওয়া হাঁটু অবধি ধুতি পরে হাত জোড় করে এসে দাঁড়ালেন। মাথায় রক্তের চিহ্ন তুলোয় লেগে আছে। সারা অঙ্গে কালশিটে আর ছড়ে যাওয়ার দাগ। বললেন, আমি ডাক্তার শ্রী নিবাস রায় এল এম এফ। ঘটনার কথা জিজ্ঞেস করলাম। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন তারপর বললেন, ১ মাঘ, মঙ্গলবার বেলা সাতটা-সাড়েসাতটা আন্দাজ আমি আমার বাড়িতে বসে প্রতিদিনের মত মানুষকে ওষুধ দিচ্ছি। বড় আবদার (আবদার মোল্লা) ওষুধ নিতে এসেছে।

এমন সময় প্রচন্ড চিৎকার, চেঁচামেচি, হৈচৈ সোরগোল,-আবদারের মুন্ডু চাই। মুন্ডু চাই বলতে বলতে হাতে লাঠি, সড়কি, রড, বল্লম হাতে শ-দুয়েক মানুষ আমার বাড়িতে ঢুকে পড়ল। তাদের নেতৃত্বে ইউসুফ গায়েন, ইরান মোল্লা ও কসার বৈদ্য। আমাকে ধরল। আমি ভয়ে থর থর করে কাঁপছি। বলল, কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস্ আবদারকে? বের করে দে, নইলে জান শেষ করে দেব। জানিস্, মাদ্রাসার কাছে গুলি হয়েছে দু'জন। তোর বাড়ি সার্চ হবে। বাক্স খোল, দেখব কি কি আছে তোর কাছে ইত্যাদি...। বাইরে তখন প্রচন্ড চিৎকার উত্তেজনা চলছে প্রায় কয়েক'শ মানুষের। এমন সময় সোনাদীঘির প্রধান বাঁশী গায়েন প্রবেশ করে এবং প্রচন্ড ভাবে মারতে মারতে আমাকে বাড়ির বাইরে বার করে নিয়ে যায়। হিঁচড়াতে হিঁচড়াতে কিছু দূরে মাঝের রাস্তায় নিয়ে যায়। দেখি, কুলতলির এস ইউ সি-র এম এল এ প্রবোধ পুরকাইত তাঁর দলবল নিয়ে দাঁড়িয়ে। তাঁর পায়ের কাছে আমাকে ফেলে দেওয়া হল। ভাবলাম, নিরাপদ জায়গায় এসে গেছি, কারণ প্রবোধ বাবু আমার সম্পর্কে বেয়াই। ওনার ভাইঝির সঙ্গে আমার ছেলের বিয়ে দিয়েছি। অনেক কাকতি মিনতি করলাম, বেয়াই, আমাকে মেরে ফেলোনা, আমি কি দোষ করেছি? কোনো কথা শুনলো না। চলল প্রবোধবাবুর নির্দেশে, প্রবোধ বাবুরই সামনে আমার উপর অকথ্য অত্যাচার। তারপর আমার আর কোনো জ্ঞান ছিল না। আর কোনো ঘটনা সে দিনের জানিনা। জ্ঞান

মাঝের রাস্তায় নিয়ে যায়, দেখি কুলতলির (এস.ইউ.সি) এম.এল এ. প্রবোধ পুরকাইত তার দলবল নিয়ে দাঁড়িয়ে।

এলে দেখলাম, আমি নীমপিঠ হাসপাতালে। এরপর প্রশ্ন করি ডাক্তার বাবুর বড় ছেলের বৌ তেইশ বৎসর বয়স্ক শ্রীমতী কল্পনা রায়কে। কল্পনা প্রবোধ পুরকাইতের নিজের ভাইঝি। পরনে বি.ডি.ও অফিস থেকে দেওয়া শাড়ি। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, আসুন ঘরের ভিতরে দেখে যান কি করেছে ওরা। সর্বস্ব নিয়ে গেছে, কিছু রেখে যায়নি। চার ঘন্টা ধরে ওরা তান্ডব-লীলা চালায়। আমার কাকা প্রবোধ পুরকাইত বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমার বাচ্চার জামা প্যান্ট, দুধ সব নিয়ে যায়। পায়ে ধরি কাকিমার (প্রবোধ পুরকাইতের স্ত্রী প্রভাতী পুরকাইত)। লাথি মেরে সরিয়ে দেয়।

ছেলের দুধের বাটিটা ভিক্ষা চাই বিশ্বজিতের (প্রবোধ বাবুর ছেলে) কাছে। গালাগালি করলো আমাকে। মারধোর করলো। সর্বস্ব লুঠ করে নিয়ে গেল। পরনের কাপড় ছাড়া কিছু ছিল না। এই দেখুন, ওরা আমার শাশুড়িকে মেরেছে। আমার স্বামী (অরবিন্দ রায়), ওঁকে দেখুন। কেমন লাঠি আর রড চালিয়েছে ওর শরীরের উপর। দেখুন, তোষক, বালিশ আর কাঁথার অবস্থা। এসব ছোট আবদারের (আবদার লস্কর) রক্ত।

পাঁচশো-সাতশো লোক বাসুদেব পুরকাইত ও বাঁশী গায়েনের (দুজনেই গ্রাম-প্রধান) নেতৃত্বে ঢুকে পড়লো আমাদের বাড়ির ভিতর, আমাদের ঘরের মধ্যে। বাধা দিতে, আমাদের মেরে সরিয়ে দিল। খুঁজতে লাগল আবদারকে। বড় আবদার বাবার কাছে ওষুধ নিতে এসেছিল। ছোট আবদারের পিঠে খাওয়ার নিমন্ত্রণ ছিল।

বড় আবদারকে ওরা বাড়ির পাশেই রাস্তা থেকে ধরে নিয়ে যায়। প্রাণ ভয়ে পালাতে চেয়েছিল সে। ছোট আবদার প্রাণভয়ে খড়ের চালের ভিতরে ঘরের উপর আশ্রয় নিয়েছিলো। ওরা ছোট আবদারকে সেখান থেকে মারতে-মারতে বাড়ির বাইরে নিয়ে যায়।

এ কথা বলতে বলতে শ্রীমতী রায় কান্নায় ভেঙেগ পড়েন। হাত জোড় করে বললেন, আমাদের প্রাণগুলি বাঁচান। আমাদের এখনো শাসাচ্ছে, হুমকি দিচ্ছে সাক্ষি না দেওয়ার জন্য। আবেদন করেছি, আমাদের এখানে একটা পুলিস ক্যাম্প করে দিন। থানাতো দু'নদী পেরিয়ে প্রায় দশ মাইল।

স্থানীয় যুবক নাসীম আলি শেখ, বাড়ি নিমপীঠ। বললেন, চলুন স্যার, ছোট আবদার ও বড় আবদারকে যেখানে শেষ করেছে, সেই জায়গায় নিয়ে যাই।

ডাক্তার বাবুর বাড়ি থেকে আনুমানিক তিন'শ সাড়ে তিন'শ গজ দূরে ধানক্ষেতের উপর রক্তের চিহ্ন আজও রয়েছে। এখানে প্রাণ হারায় ছোট আবদার। রক্ত মাখা জায়গাটার চারিদিকে গর্ত করা। প্রশ্ন করলাম, গর্ত কেন? গ্রামবাসীরা বলল, ওগুলো শিয়াল-কুকুরের আঁচড়ানোর দাগ। ঠিক একশ গজ দূরে ধানক্ষেতের গায়ে, বড় রাস্তার পাশে বড় আবদারের (আবদার মোল্লা) সঙগহীন দেহটাকে রেখে, বল্লমের খোঁচা দেওয়া হয় বুকে। ফিনকি দিয়ে রক্ত ওঠে। বড় আবদার প্রাণ হারাণ।

এরপর গ্রামের লোকেদের সঙেগ এগিয়ে চললাম যে সব বাড়িতে লুঠপাট হয়েছে, সেই বাড়িগুলোর দিকে এবং ছোট আবদার ও বড় আবদারের পরিবারের লোকজনদের মুখে সেই ঘটনার বিবরণ নিতে।

পথের মধ্যে এক ভদ্রলোককে ধরে-ধরে নিয়ে এলো গ্রামবাসীরা। ৫'৬" উচ্চতার পাতলা ছিপছিপে দেহ, এক মুখ লম্বা দাড়ি। জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে? ভদ্রলোক বললেন আমার নাম ইয়াকুব আলি পেয়াদা। আমি ছোট আবদারের অভাগা শ্বশুর। দূরে একটি বাড়ি দেখিয়ে বললেন, আমাদের গ্রামের মাদ্রাসা। নাম মাদ্রাসা আস্রাফিয়া দার উন-উলুম। আমি সেখানকার তৃতীয় শিক্ষক। আসুন আমার সঙেগ ছোট আবদারের বাড়ির দিকে। আলের উপর দিয়ে মাঠ বরাবর শর্টকার্ট রাস্তা দিয়ে বাগানের ভিতর দিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় বললেন, এই বাগানে আবদারকে মাটি দিয়েছি। এগিয়ে চললেন ছোট আবদারের বাড়ির দিকে। বাড়িতে পৌছে বুঝলাম, গ্রামের অবস্হাপন্ন ঘর। দোতলা মাটির বাড়ি। বেশ কয়েকটি এক তলা ঘর সামনে অনেকটা জায়গা ভাঙগা টালির স্তুপাকার। সেগুলি ডিঙিগয়ে গেলাম। খড়ের ছাউনি বলতে কিছু নেই। দুস্কৃতকারীরা সবকিছু চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়ে গেছে। গ্রামের বাসীন্দারা এবং প্রতিবেশীরা আবদারের মাকে ও বৌকে সান্ত্বনা দেওয়াতে ব্যাস্ত।

আবদারের মার কাছে এগোতেই বৃদ্ধা কেঁদে উঠলেন। একটি মাত্র কথা বললেন, "ওরা আমার বংশ রাখবেনা বাবা।" পাশের বাড়ির ষাঠ বৎসর বয়স্কা খাতুনা বিবি একটি দেড় বছরের শিশুকে কোলে এনে বললেন, এ ছেলেটা আবদারের ছেলে। ফতেমা (কমরেড ফতেমা এস ইউ সির মহিলা নেত্রী) ওকে ওর মার কোল থেকে ছিনিয়ে নেয়। নিয়ে এই পুকুরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। ফতেমা আর এম এল এ যখন ঘরের জিনিসপত্র তছনছ করছে, আমাদের বাড়ির মেয়েদের বেরোতে দিচ্ছে না আটকে রাখছে, সেই সময় আমি পুকুর থেকে বাচ্চাকে তুলে নিয়ে আমার ঘরে পালিয়ে যাই। ওরা সব নিয়ে গেছে। আলমারি ভেঙেগ সব নিয়ে গেছে। দেখলাম, ভাঙগা আলমারি ঘরে গড়াগড়ি খাচ্ছে।

আবদারের স্ত্রী হয়নাব বিবিকে জিজ্ঞেস করলাম শুনলাম আপনাকে এবং মাকে ওরা ভাতের সঙেগ রক্ত মাখিয়ে খেতে বলেছিল শুধু খেতে বলেনি, আবদারের রক্ত মাখা ভাত আমাকে আর মাকে খাওয়ানোর জন্য

ফতেমা জোর-জবরদস্তি করেছিল। আমরা খাইনি। এরপর গেলাম আবদারের বাবা পয়েদ আলির কাছে মাঝারি গড়ন, গায়ের রং কালো, কাঁচা-পাকা দাড়ি, পরনে হাঁটুঅবধি ধুতি, নতুন কম্বল। সেদিনকার ঘটনা জিজ্ঞেস করতে হাত জোড় করে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। 'আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, সব শেষ হয়ে গেছে। আল্লার কসম খেয়ে বলছি, মিথ্যে কথা বলতে পারবো না। যা বলবো সত্য বলবো নইলে পাপ লাগবে। তারিখ-ফারিখ বাবু বলতে পারবো না। সেদিন সিকির হাট ছিলো। রাত্রি নটা-সাড়ে নটা হবে ভাত খেয়ে উঠে, হ্যাজাক জালিয়ে দু'তলায় বসে বিড়ি খাচ্ছি, সঙ্গে কালীবাবু। প্রশ্ন করলাম, কালী বাবু কে? বললেন, কালীপদ মন্ডল বয়োজ্যেষ্ঠ কংগ্রেস কর্মী, স্থানীয় বিচারক। এমন সময় বাঁশরী গায়েনের নেতৃত্বে একদল মানুষ এসে বললো, প্রধানসাহেব ডাকছে মাদ্রাসার কাছে। আমি এবং কালীবাবু দুজনে গেলাম। রাস্তার কোণে দেখলাম জটলা। দেড়শ-দুশো লোক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বাসুদেব পুরকাইত (প্রধান)। পায়ের কাছে বসলাম। বললাম, প্রধান সাহেব, কি হয়েছে? আমি তো কিছু জানিনা। জানোনা? এস ইউ সি দলের লোকেদের বোমা মেরেছে, গুলি করেছে। আমি কি করেছি? আমায় ডেকেছেন কেন? তোমার ছেলে জড়িত। আমার ছেলে? কখনকার ঘটনা? সন্ধ্যের পরের ঘটনা। তখনতো ছেলে আমার হাটে। তাহলে ওর ইঙ্গিত আছে। কি করে বুঝলেন ওর ইঙ্গিত আছে প্রধান সাহেব? এই চুপড়িপাড়া অঞ্চলে যদি কোনো চুরি চামারি হয়, তাহলে আমার ঘর থেকে আমি জানি। তোর ছেলে এবার পঞ্চায়েতে এত ভোটে জিতেছে কিছু জানেনা, এটা হতে পারে? কালকে তোমার ছেলের মুন্ডু নিয়ে তোমার বাড়িতে যাবো দেখো।

ভয়ে জড়সড় হই। ছেলের জান বাঁচাতে ছেলেকে খুঁজতে বেরোলাম। সারা রাস্তা ছেলের দেখা পাইনি। পহরের আজান (নামাজের সময়) হঠাৎ কিছু ছেলে বাড়িতে আসে এবং প্রধান ডেকেছে বলে। যাবো বলে তৈরি হচ্ছি, এরই মধ্যে সদলবলে লোকজন বাড়িতে এসে চড়াও হয়ে বাড়ির টালি ভাঙতে শুরু করে। চালের খড় ছড়িয়ে দেয়। ঘরের ভিতর ঢুকে লুঠ পাঠ শুরু করে দেয়। কান্নাকাটি করি, কোনো লাভ হয় না। রাধাবল্লভপুরের এম এল এ প্রবোধবাবুর পায়ে ধরি, কোনো ফল হয়নি। কিছুক্ষণ পরে এস ইউ সি ঢেঁড়া পেটায় ভাই সব ছুটে চলুন, আবদার ধরা পড়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে মানুষেরা একসঙ্গে দৌড় দেন? কালী বাবু ও আমিও ওদের পিছু নিলাম। কিছুদূরে দেখলাম ফতেমা ও প্রভাবতী দেবীর নেতৃত্বে মহিলা বাহিনী দুই প্রধান ও কুলতলি বিধায়ক ও অন্যান্য কমরেডদের মাঝে ছেলে বসে আছে। প্রবোধ বাবুর পরনে ছিল ধুতী ও হলুদ রঙের পাঞ্জাবি। গিয়ে পায়ে ধরলাম আমি, কালীবাবু-ছেলেকে মেরে ফেলবেন না। আমার হাতে তুলে দিন। কোনো কথা শুনলেন না। মারের পর মার চললো দুজনকে (ছোট আবদার ও বড় আবদার) ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত বেরোতে লাগলো। বড় আবদারের রক্ত ফিন্‌কি দিয়ে উঠে প্রবোধ বাবুর ধুতিতে লাগে। প্রবোধবাবু সেই রক্ত আমার গায়ে লাগিয়ে দেয়।

কসার বদ্যিকে প্রবোধ বাবু নির্দেশ দেয়, এটা তো জ্যান্ত আছে, মেরে দাও। নির্দেশে কাজ হয়। কমার বদ্যি বড় আবদারকে আমার সামনে শেষ করে দেয়।

শুরু হয় আমার ছেলের উপর আক্রমণ। কয়েকজন দস্যু আমাকে আর কালীবাবুকে ঘাড় ধরে আস্রাফিয়া দার উল উলুম মাদ্রাসায় ঢুকিয়ে দেয়। দুদিন ভয়ে বের হইনি মাদ্রাসার মধ্যে থেকে।

মাদ্রাসার ভিতরে রাতভোর হৈচৈ মদ্যপান চলে। খাওয়া দাওয়া চলে। লুঠের মাল ভাগ হয়। আমাদের মাঝে মাঝে এসে শাসায়, কেস্ যেন না হয়, পুলিস ক'দিন থাকবে? ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে দেব, আরো খুন করবো।

মাদ্রাসার ধর্মীয় গ্রন্থ কোরাণ শরীফ লাথি মেরে ফেলে দেয়। মাদ্রাসার তৃতীয় শিক্ষক ইয়াকুব আলি বলেন, তিরিশ বস্তা ধান, আড়াই হাজার টাকা ও মাদ্রাসার যাবতীয় জিনিসপত্র লুঠ করে। বাইশজন আবাসিক ছাত্রের বেডিং পত্র নিয়ে যায়। পয়েজ আলীর বাড়ির ধানভাঙ্গা মেশিনের কিছু অংশ পড়ে থাকতে দেখা যায়। বাকি অংশ দুস্কৃতকারীরা নিয়ে যায়। মাদ্রাসার জনৈক ব্যক্তি বলে ওঠেন, সেদিনকার ঘটনা ছিল পূর্ব পরিকল্পিত এবং বুদ্ধিমান লোকের মস্তিষ্ক প্রসূত। জিজ্ঞাসা করি, কি করে বুঝলেন? বললেন, গত পঞ্চায়েত নির্বাচন থেকেই ওদের আমাদের উপর খুব রাগ। আরো বেড়ে যায় লোকসভা নির্বাচনে।

আমাদের প্রাণগুলি বাঁচান। আমাদের একটা পুলিশ ক্যাম্প করে দিন। থানাতো দু'নদী পেরিয়ে প্রায় ১০ মাইল।

ওরা বাইরে থেকে অনেক লোক ভাড়া করে এনেছিল এবং সেটা আগেই ঠিক ছিল। লোকজনদের খাওয়ানোর জন্য প্রধান সাহেব নিজে গত শুক্রবার হাটে দুবস্তা চিঁড়ের অর্ডার দেয় সোমবার পাওয়ার জন্য। সোমবার রাত থেকেই ঘটনার সূত্রপাত এবং মঙ্গলবার দু'দুটি খুন। প্রায় পাশেই বড় আবদারের বাড়ি। বাড়ির ভেতরে গিয়ে বোঝা গেল অবস্থা খুবই খারাপ। বাড়ির বারান্দায় একদল লোকজন নিয়ে বসে রয়েছেন বড় আবদারের দুই স্ত্রী আসিফা বিবি ও জায়দা বিবি। আফিসা বিবির ছয়টি সন্তান, জায়দা বিবির চারটি সন্তান। সবই প্রায় ছোট ছোট। জিজ্ঞাসার করার আগেই দুই স্ত্রী কেঁদে বলে উঠলেন, আমাদের কি হবে? কে দেখবে আমাদের? বাড়ির সর্বস্ব নিয়ে গেছে। আঠেরো বস্তা ধান, বারো মন চাল, প্রায় পাঁচ হাজার টাকা। এই দেখুন, বিডিওর দেওয়া কাপড় ছাড়া আর কিছুই নেই। আমরা খবর পেলাম, আমাদের লোককে মারছে, মেরে ফেলছে। বেরোতে যাবো, বাঁচতে যাবো পারলাম না। ওদের পার্টির মেয়েরা আমাদের আটকে রাখলো বাড়িতে। আমাদের বেরোতে দিলনা।

এরপর চুপড়িহাটা অঞ্চলে সক্রিয় যুবকর্মী আমজেদের বাড়ি গেলাম। আমজেদ এ অঞ্চলের রোখা ছেলে। যে কোনো ব্যাপারে প্রতিবাদ করা ওর স্বভাব। ভয়-ডর কম। আমজেদকেও ওরা খুন করতে এসেছিল, কিন্তু পায়নি। কথাগুলো গ্রামের বিভিন্ন বয়সের লোকেরা বলেছিলেন। বাড়িতে গেলাম। দোহারা চেহারার এক ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন, নাম ইমজেদ পেয়াদা। আমজেদের বাবা। বললেন আমার ছেলেকে ওরা মার্ডার করতে আসে। আমার সব জিনিস লুঠ করেছে। জোড় লাঙগল, সিন্দুক, কুড়ি বস্তা ধান, পাঁচ মণ চাল, পাল্লা, সব নিয়ে গেছে। বাসনপত্র বাদ দেয়নি।

হুমকি দিচ্ছে আবার মার্ডার করবো। কেস্ করেছো? পুলিস কদিন গার্ড দেবে? এমন সময় ধরাধরি করে এক অশীতিপর বৃদ্ধাকে ধরে নিয়ে এলো গ্রামের লোকেরা। জীর্ণ-শীর্ণ দেহ, শরীরের সমস্ত চামড়া অপুষ্টিতে এবং বয়সের ভারে কুঁচকে গেছে। নাম হারমণি বিবি। বয়স সত্তর বৎসর। ডান হাত ভাঙগা, ব্যান্ডেজ করা। বললাম, কি হয়েছে আপনার? অনেক কষ্টে তোতলাতে তোতলাতে যা বললেন, তা হলো---আমি লুঠ করতে নিষেধ করেছিলাম, বাধা দিয়েছিলাম তাই এম এল এ ও প্রধানের আদেশে আমার হাত ভেঙে দেয়।

গ্রামের মানুষেরা ভীত-সন্ত্রস্ত। ওদের চোখে-মুখে একটা প্রশ্ন বিরাজ করছে, সেটা হলো, গ্রামের শান্তি থাকবে কিনা। শান্তিতে বাস করতে পারবে কিনা। আবার কোন মা বা স্ত্রীকে ছোট আবদার বা বড় আবদারের হারানোর যন্ত্রনা ভোগ করতে হবে কিনা। পুলিশ ও প্রশাসন এর যথোপযুক্ত কি ব্যবস্থা নিয়েছেন বা নেবেন। রাধাবল্লভপুরে স্থায়ী পুলিশ ফাঁড়ি বা ক্যাম্পের ব্যবস্থা প্রশাসন করবে কি না। দোষীদের গ্রেপ্তার করে বিধিসম্মত শাস্তির দাবি জানায় গ্রামবাসীরা।

কুলতলি থানা ও বিধানসভার অন্তর্গত রাধাবল্লভপুর গ্রামের মোট তেইশটি পরিবারের সর্বস্ব লুঠ হয়। তেইশটি পরিবারের মোট সদস্য সংখ্যা প্রায় সাড়ে তিন'শ জন।

সরকার থেকে বি ডি ও-র মাধ্যমে দেয় মাত্র চার কুইন্টাল চাল ও তিরিশ কেজি এবং একটি করে আট হাতি ধুতি ও দশ হাতি শাড়ী। এ ব্যাপারে গ্রামবাসীরা ভীষণ ক্ষুব্ধ। অনেকেই বললেন এর চেয়ে না দেওয়া ভালো ছিল।

খুন হয় ১৫ তারিখ, পুলিশ আসে ১৭ তারিখ হঠাৎ, দুদিন পর। জেলা শাসক সমেত অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপরাধ) আসেন ১৮ তারিখ।

খুন হয় ১৫ তারিখ সকালে মৃতদেহ দুটি ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হয় ১৭ তারিখে এবং মৃতদেহগুলি গ্রামে আসে ১৯ তারিখে।

গ্রামের মানুষের জিজ্ঞাসা, এ আমরা কোথায় বাস করছি? পশ্চিমবাংলায় না সুন্দরবনের জঙগলের রাজত্বে? এ অব্যবস্থারা কি কোনো সুরাহা বা প্রতিকার সরকার করবেন?□

সোমেন মিত্রর কুলতলি অভিযান

পশ্চিম বাংলার যুব কংগ্রেসের সভাপতি ও বিধায়ক শ্রী সোমেন মিত্র যুব কংগ্রেসের এক প্রতিনিধি দল নিয়ে গত ৪ ফেব্রুয়ারি দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার কুলতলি থানার অন্তর্গত অভিশপ্ত রাধাবল্লভপুর গ্রামটি দেখতে যান। সঙ্গে ছিলেন জেলা যুব কংগ্রেসের সভাপতি গৌরীশংকর ভট্টাচার্য ও প্রদেশ যুব কংগ্রেসের সম্পাদক গবন্ধু মন্ডল। তিনি আবদুর রহমান লস্কর ও আবদার আলি মোল্লার বাড়িতে যান ও আশ্বস্ত করেন শোকসন্তপ্ত পরিবার-বর্গকে। ঘটনার সূত্রপাত যেখানে, সেই ডাঃ নীবাস রায়ের বাড়িসহ গ্রামের ক্ষতিগ্রস্ত ২৩টি বাড়িতে যান। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সকলকে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করবেন বলে যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কথা দেন। এ ঘটনার সমস্ত কিছু তিনি লিখিতভাবে প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর কাছে জানাবেন এবং তাঁর কাছ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের লোকেদের সাহায্যের জন্য অনুরোধ করবেন বলেন।

সারাদিন গ্রামের বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে কথাবার্তা ও দুঃখ-দুর্দশার কথা শোনার পর বিকেলের এক বিশাল সমাবেশে শ্রী মিত্র বক্তৃতা করেন। প্রায় ৬,০০০ মানুষ উপস্থিত ছিলেন। তিনি বামফ্রন্ট সরকারের কড়া সমালোচনা করেন। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির ক্ষতিপূরণ দাবী করেন এবং অবিলম্বে প্রবোধ পুরকাইত সমেত সকল অপরাধীদের শাস্তির দাবী জানান।

কুলতলিতে খুনের ইতিহাস দীর্ঘকালের

শুভাশিস মৈত্র

এস. ইউ. সি. আই অফিসে যেতেই, সংবাদ পত্রের বিরুদ্ধে সব থেকে বেশি অভিযোগ আনলেন নেতা শ্রীদেবপ্রসাদ সরকার। রক্তমাখা ভাত আর ধর্ষন কাহিনী ছেপে কলকাতা তোলপাড় করেছে সমস্ত খবরের কাগজ। এইসব যে কত মিথ্যা তাই নিয়ে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা চালালেন দেবপ্রসাদ বাবু। কিন্তু সম্ভবত দেবপ্রসাদবাবুর রাজনৈতিক দলের এই টুকু বুকের পাটা নেই যে খবরের কাগজের বিরুদ্ধে মামলা করবেন। যদি মিথ্যে বা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত খবর ছেপে থাকে খবরের কাগজ গুলো তবে তা প্রমাণ করবার আইনী সুযোগ সুবিধে তাঁরা কেন গ্রহণ করলেন না?

প্রবোধ পুরুকাইত, হত্যাকান্ডের সময় ঘটনা স্থলে ছিলেন একথা কংগ্রেস ছাড়া অন্য কোন তথ্য অনুসন্ধানকারী রাজনৈতিক বা অরাজনৈতিক দল বলছে না। তবে যারা হত্যাকান্ডটি ঘটিয়েছেন তাদের গ্রামের লোকজনেরা চেনেন, তাদের নামধাম তাঁরা বলেছেন, এবং তারা যে এস. ইউ. সি. সমর্থক নয় একথা এস. ইউ. সি. নেতারা বলছেন না। তাঁরা যা বলছেন তা হল, এই কুলতলি থানাতেই কংগ্রেস তাঁদের ১৪ জন কমরেডকে হত্যা করেছে। পুরো ব্যাপারটা সহোর সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। সেদিন যখন দুজন কংগ্রেস সমর্থক গ্রামের প্রধানকে গুলি করে, এস. ইউ. সি. সমর্থকদের স্বাভাবিক ক্রোধের এক বহিঃপ্রকাশ ঘটে। তারই ফলশ্রুতি হল এই জোরা খুন। অর্থাৎ যে দু'জন এস. ইউ সি কমরেড গ্রামের প্রধানকে হত্যা করবার জন্য গুলি চালায়, তাদের জনরোষের মুখে পড়তে হয়, এবং আব্দার মোল্লা এবং আবদুর রহমান নস্করকে ক্ষিপ্ত জনতা হত্যা করে।

এটা কি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বা বড় জমিদারদের গুন্ডা বাহিনীর বিরুদ্ধে সচেতন জনতার শ্রেণী ঘৃণার প্রকাশ বলা যায়? এস ইউ সি. নেতারা কিন্তু তা মানতে রাজী নয়। তাঁরা এটাকে একটা দুর্ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত করতে চাইছেন, এবং বিভিন্ন কাগজ পত্রে এস. ইউ. সি. যে কত শান্তিপ্রিয় রাজনৈতিক দল তা প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন নানা ভাবে।

এটা ঠিকই নিহত আবদুর রহমান ও আবদার মোল্লা, দুজনেই কংগ্রেসের সমর্থক। তারা সত্যিই সেদিন গুলি চালিয়ে ছিল, এবং তাদের বিরুদ্ধে স্থানীয় থানায় জমিদারের হয়ে ভাগচাষীকে ফসল না কাটতে দেবার জন্য গুন্ডামির অভিযোগও আছে।

বাম ডান কোন রাজনীতিই গ্রামের মানুষকে সচেতন করেনি, কিন্তু হাতে পাইপ গান তুলে দিয়েছে। তার ভয়ংকর ফলাফল প্রকাশ পেতে শুরু করেছে দীর্ঘকাল ধরেই। কুলতলিতে কংগ্রেস এবং এস. ইউ. সি. দুপক্ষের হাতেই আছে দীর্ঘ নিহতের তালিকা কংগ্রেসের কুমুদ ভট্টাচার্য বলেছেন গত কয়েক বছরে এস. ইউ. সি.-র হাতে নিহত কংগ্রেস কর্মীর সংখ্যা ৪১ জন। রাজ্য কংগ্রেসের সম্পাদক সন্তোষ রায় বলেছেন এই সংখ্যা ৩৯ জন। অন্যদিকে এস. ইউ. সি. আই-র দাবি কংগ্রেসের হাতে তাদের নিহত কমরেডের সংখ্যা ১৪ জন। এই হিসেব কতদূর সত্যি বলা কঠিন। তবে খুন, ধর্ষণ, লুঠ এই নিয়ে গড়ে উঠেছে গ্রাম বাংলার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট। ডান, বাম কোন দলই এর দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারে না।

প্রবোধ পুরকাইত আগাম জামিনের জন্য চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিলেন। পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন বেশ কিছুদিন। মার্কসবাদীরা ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে বিশ্বাস করেন না। কিন্তু যেই দেখা গেল আদালত প্রবোধবাবুর সম্পত্তি ক্রোক করেছে, অমনি প্রবোধবাবু লক্ষ্মী ছেলের মত ধরা দিলেন। এটাও অবশ্যই মার্কসবাদীদের ইতিহাসে মনে রাখবার মত ঘটনা। □

কুলতলি প্রসঙ্গে এস. ইউ. সি. আই কি বলছে

সম্প্রতি দঃ ২৪ পরগণার কুলতলি থানার একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস (ই) নেতাদের বিবৃতিতে এবং কিছু কিছু সংবাদপত্রের নিজস্ব প্রতিবেদনে আমাদের দল এস ইউ সি আই-এর বিরুদ্ধে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রচার অভিযান চালানো হচ্ছে। এস ইউ সি আই দল ও তাদের নেতা-কর্মীদের সম্পর্কে জনসাধারণের শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও আস্থা অত্যন্ত গভীর বলেই একই সংবাদ প্রতিদিন নানা কথায় সাজিয়ে এমনভাবে পরিবেশন করা হচ্ছে যাতে দেশের ব্যাপক জনসাধারণের মধ্যে এস ইউ সি আই সম্পর্কে একটা তীব্র বিদ্বেষমূলক মনোভাব জাগিয়ে তোলা যায়। অন্যদিকে এরই আড়ালে কুলতলির বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে কংগ্রেস (ই) ব্যাপক সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। বাড়ি বাড়ি জোতদার-কংগ্রেস (ই) চক্রের গুন্ডাবাহিনী হামলা চালাচ্ছে। ফলে আমাদের দলের নেতা-সংগঠক-কর্মী-সমর্থক ও অসংখ্য দরদী সাধারণ গরীব মানুষ আজ ঘরছাড়া। দুঃখের ও ক্ষোভের বিষয় হল, বাস্তব পরিস্থিতির এই দিকটি কোন সংবাদপত্র প্রকাশ করছে না। ফলে এই সিদ্ধান্তে আমরা না এসে পারিনা যে, এস ইউ সি আই বিরোধী মিথ্যা প্রচারে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করা এবং তার আড়ালে এস ইউ সি আই সংগঠিত অঞ্চলে আক্রমণ চালিয়ে ও সন্ত্রাস সৃষ্টি করে গরীব চাষি ও ভূমিহীন ক্ষেতমজুরদের জোতদার বিরোধী সংগ্রামকে পর্যুদস্ত করার পরিকল্পনাই গোটা বিষয়টির পিছনে কাজ করছে।

সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মধ্যে কুলতলি-জয়নগর হল এমন একটি এলাকা যেখানে কুখ্যাত জোতদার ও কায়েমী স্বার্থবাদীদের বিরুদ্ধে গরীব চাষি, বর্গাদার ও ভূমিহীন ক্ষেতমজুরদের বহু রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের গৌরবময় ইতিহাস রয়েছে। তেভাগা আন্দোলনের সময় থেকেই এই অঞ্চলের গরীব চাষী ও বর্গাদাররা এস. ইউ. সি. আই-এর নেতৃত্বে সংগঠিত হয়ে জোতদার-মহাজন-কায়েমী স্বার্থবাদীদের বিরুদ্ধে মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত। সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে শ্রদ্ধেয় নেতা কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী ও কমরেড শচীন ব্যানার্জীর নেতৃত্বে বহু সংগ্রামের আগুনে পুড়ে ইস্পাতকঠিন ঐক্য ও দৃঢ়তা নিয়ে গড়ে উঠেছে এই অঞ্চলে আমাদের দলের সংগঠন। গরীব চাষিমজুরের এই লৌহদৃঢ় সংগঠনকে

ভাঙগার জন্য জোতদার-কায়েমী স্বার্থবাদীরা দীর্ঘদিন থেকে চেষ্টা চালিয়ে আসছে আমাদের দলের অসংখ্য নেতা-সংগঠক ও কর্মীকে তারা নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। তাদের ঘর-বাড়ী জ্বালিয়ে দিয়েছে। মিথ্যা মামলায় বছরের পর বছর হয়রানি করেছে, জেলে দিয়েছে। গোটা কংগ্রেসি শাসনে এই জিনিস নির্বিচারে ঘটেছে, পরবর্তীকালেও তার কোন ব্যতিক্রম হয়নি। গত কয়েকবছরের কথা বাদ দিয়ে কেবল গত এক বছরেই চার জন এস. ইউ. সি. আই -এর বিশিষ্ট সংগঠক ও কর্মীদের জোতদার-কংগ্রেস (ই) চক্র নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। গত ২৪ শে এপ্রিল কলকাতায় দলের প্রতিষ্ঠা দিবসের সমাবেশ থেকে আমাদের দলের কর্মীরা যখন বাড়ী ফিরছিলেন, তখন বেলেদুর্গানগর অঞ্চলে বোমা ছুঁড়ে কমরেড বিদ্যাধর হালদার ও রাধাকান্ত প্রামাণিককে হত্যা করে এবং ১৮ জন কর্মীকে গুরুতর আহত করে। ১০ জুলাই কুলতলি ১ নং মেরীগঞ্জ অঞ্চল-প্রধান, আমাদের দলের বিশিষ্ট সংগঠক, গরীব মানুষের অত্যন্ত প্রিয় কমরেড মোকাররম খাঁ-কে প্রথমে গুলিবিদ্ধ করে ও পরে কুপিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে আজও কুলতলির গরীব মানুষের মনে কমরেড মোকাররম-এর সংগ্রামী স্মৃতি উজ্জ্বল হয়ে আছে। আজও তারা মোকাররম-এর স্মৃতিতে চোখের জল ফেলে, সংগ্রামের শপথ নেয়। অথচ, এইসব ঘটনা সংবাদপত্রে জানানো সত্ত্বেও কোনদিন গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করার প্রয়োজন তারা মনে করেন নি। এসব ঘটনা তাদের বিবেকে কোন আলোড়ন তোলেনি। ওদের আক্রমণে যেসব স্ত্রী স্বামীহারা হয়েছে, মা হয়েছে সন্তানহারা তাদের খোঁজ নেবার কোন প্রয়োজন তারা অনুভব করেননি। বিগত লোকসভা নির্বাচনের সময়েও ৪ ডিসেম্বর কুলতলি থানার দেউলবেড়িয়া অঞ্চলে আমাদের দলের কর্মী কমরেড নূর মহম্মদ মোল্লাকে জোতদার-কংগ্রেস (ই) চক্র ছুরি মেরে হত্যা করে। ঐ সময় নির্বাচনী সংবাদ সংগ্রহ করতে সাংবাদিকরা ঐসব অঞ্চলে ঘুরছিলেন। কিন্তু তখনও তাদের তৎপর হতে দেখা যায়নি।

অথচ, ১৪ ই জানুয়ারীর কুলতলির ঘটনাকে নানাভাবে বিকৃত করে কংগ্রেস (ই) নেতৃত্ব ও কিছু কিছু সংবাদপত্র প্রমাণ করতে চাইছেন যে, এস. ইউ. সি. আই প্রতিহিংসাপরায়ণ, এ দলের নেতা-কর্মীরা খুনী অত্যাচারী পাশবিক। কিন্তু জনসাধারণ জানেন, এস. ইউ. সি. আই কোনদিন ব্যক্তিহত্যার রাজনীতিতে বিশ্বাসী নয়।

প্রতিহিংসার রাজনীতির চর্চা আমরা করিনা। করলে ক্যানিং-এ গোপালপুর অঞ্চলপ্রধান আমাদের দলের বিশিষ্ট সংগঠক কমরেড সুজাউদ্দিন আখন্দের নৃশংস হত্যাকান্ড, কমরেড মোকাররম খাঁ-র বর্বর হত্যার পর বহু কিছুই ঘটতে পারত। যে কুলতলি সাম্প্রতিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে আমাদের বিরুদ্ধে কুৎসার বন্যা বইয়ে দেওয়া হচ্ছে, সেই কুলতলি থানাতেই ১৪ জন এস. ইউ. সি. আই কর্মী ও সংগঠক গত কয়েক বছরে কংগ্রেস (ই) পুষ্ট জোতদারদের হাতে নিহত হয়েছেন। এমনকি '৬৭ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের শরিক হিসাবে আমরা যখন পশ্চিমবঙ্গের সরকারে ছিলাম, তখন এই কুলতলিরই ঘটিহারানিয়া গ্রামে আমাদের দলের চারজন বিশিষ্ট কর্মীকে কংগ্রেসীরা ডেকে নিয়ে খাবারের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে হত্যা করেছিল। আমরা সেদিনও প্রতিহিংসার রাজনীতির চর্চা করি নি। এ কথা ঠিক, আমাদের নেতৃত্বে সংগঠিত গণ আন্দোলনে সংঘর্ষে কোথাও কেউ হয়তো নিহত হয়ে থাকতে পারেন; কিন্তু সন্ত্রাস ও ব্যক্তিহত্যার রাজনীতির আমরা বিরোধী। তাই আজ আমাদের দলের উজ্জ্বল ভাবমূর্তিকে বিনষ্ট করার জন্য আমাদের দলের নেতা ও কর্মীদের চরিত্র হনন করার হীন উদ্দেশে কংগ্রেস (ই) নেতৃত্ব ও কিছু কিছু সংবাদপত্রকে মিথ্যাচারের আশ্রয় নিতে হচ্ছে। নাহলে আব্দুর রহমান লস্করকে মাঠে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে তারপর তার রক্ত নিয়ে এসে ভাতের সাথে মিশিয়ে তার মাকে খাওয়ানো বা ১৪ জন মেয়ে মাফুজা খাতুনের উপর দলবদ্ধভাবে ধর্ষণের কল্পিত কাহিনী তারা পরিবেশন করেন কি করে? বিশেষ করে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে যেভাবে কুলতলি কেন্দ্রে নির্বাচিত এস. ইউ সি আই এম এল এ কমরেড প্রবোধ পুরকাইতের নাম উদ্দেশ্যমূলকভাবে জড়ানো হচ্ছে তাতে চক্রান্তটি অত্যন্ত প্রকট।

তাঁরা যে সম্পূর্ণ মিথ্যার ওপর ভিত্তি করে এস. ইউ সি. আই বিরোধী এই অভিযানে নেমেছেন, তা তাদের বক্তব্য থেকেই ধরা পড়ে। কংগ্রেস (ই) নেতা শ্রী কুমুদ ভট্টাচার্য্য ৪১ জন নিহত কংগ্রেস কর্মীর তালিকা পুলিশকে দিয়েছেন। রাজ্য কংগ্রেস (ই) সম্পাদক শ্রী সন্তোষ রায় ২২ শে জানুয়ারী আজকাল পত্রিকায় আমাদের দলের বিরুদ্ধে বললেন, '৭৮ সাল থেকে ছ'বছরে ৩৯ জন কংগ্রেস কর্মী এস. ইউ. সি. আই-এর হাতে খুন হয়েছে। একই দিনে বর্তমান পত্রিকায় তিনিই বললেন, ছ'বছরে ৩৭২৯ জন কংগ্রেস কর্মী এস. ইউ. সি. আই-এর হাতে খুন হয়েছে। এর কোনটা সত্যি? তাছাড়া এই হিসাব মেনে নিলে দাঁড়ায় '৭৮ থেকে '৮৪ এই ছয় বছরে প্রতিদিন গড়ে একাধিক কংগ্রেস কর্মী এস. ইউ. সি. আই-এর হাতে খুন হয়েছেন। এর থেকে হাস্যকর মিথ্যা আর কি হতে পারে? কিছু কিছু সংবাদপত্র এই মিথ্যাচারকেই ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে প্রকাশ করছেন, কিন্তু পাশাপাশি আমাদের দলের পূর্ণ বক্তব্য প্রকাশ করছেন না আজকাল পত্রিকা গত ১৯, ২০ ও ২১ তারিখে কুলতলির ঘটনা সম্পর্কে সংবাদ প্রকাশ করেন। সংবাদের প্রতিটি ছত্র ছিল অসঙ্গতি ও অসত্যে পূর্ণ।

তারা লিখেছেন সদানন্দ ঘুঘু কংগ্রেসের লোক। তাহলে প্রশ্ন ওঠে কংগ্রেসের লোককে কি কংগ্রেসীরাই গুলি করেছে? এবং তাই নিয়ে এস. ইউ. সি. আই সমর্থকরা

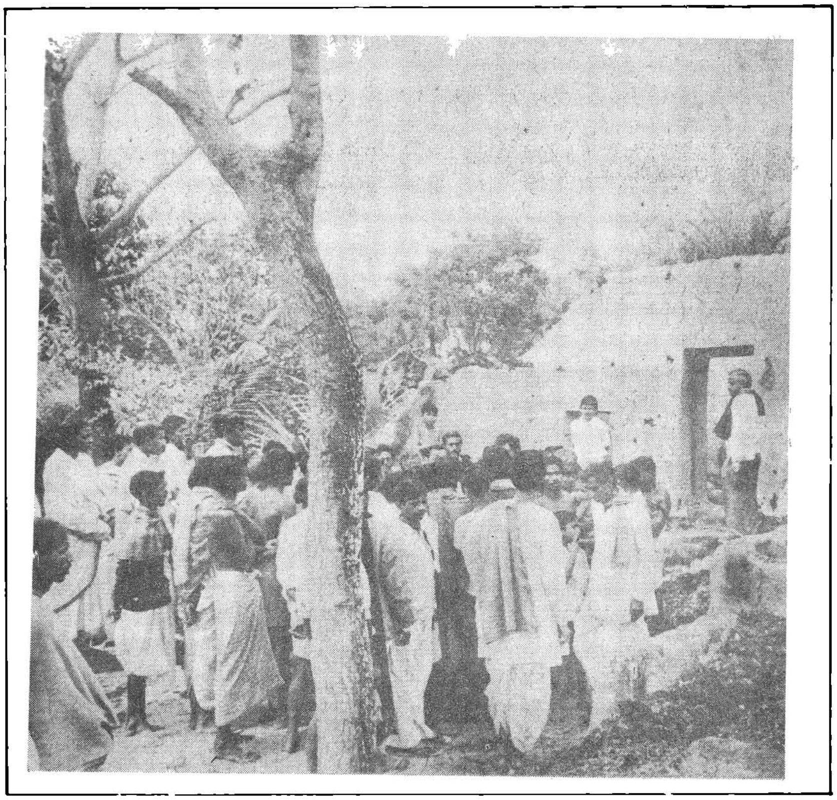

কংগ্রেসীদের মেরেছে? এরপর তারা লিখেছেন 'দুর্বৃত্তরা তার বাড়ীতে আব্দুর রহমান লস্করের খোঁজ না পেয়ে তার অন্তঃস্বত্বা যুবতী স্ত্রীকে বিবস্ত্র করে মারধোর করে। পরে তার দেড় মাসের সন্তানকে জলে ছুঁড়ে ফেলে দেয়'। এটা কি সম্ভব? তারা একবার বলছেন দেড় মাসের শিশুর জননী আর একবার বলছেন অন্তঃস্বত্বা -- কোনটা সত্যি? এটাও ভাবলেন না যে, কোন দেড় মাসের বাচ্চাকে পুকুরে ফেলে দিলে যত তাড়াতাড়িই তাকে তোলা হোক না কেন, তার পক্ষে কি বাঁচা সম্ভব? এরপর তারাই বলেছেন যে, কংগ্রেসীদের শক্তিবৃদ্ধিতে আতংকিত হয়ে এস. ইউ. সি. আই এই হামলা চালিয়েছে। এরপর তারাই লিখেছেন যে, গত লোকসভা নির্বাচনে এই কুলতলি থানায় এস. ইউ. সি. আই-এর শক্তি পূর্বের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। কথাটা পরস্পরবিরোধী নয় কি?

আমাদের দলের পঃ বঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড সুকোমল দাশগুপ্ত স্বয়ং ২১ জানুয়ারী আজকাল পত্রিকার সম্পাদকের সাথে দেখা করে প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ করেন এবং লিখিত প্রতিবাদপত্র দিয়ে তা প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ জানান। কিন্তু প্রতিবাদপত্র পুরোটা তারা প্রকাশ করেন না। পরের দিন তাদের কাছে গিয়ে একই অনুরোধ করা হয় এবং কংগ্রেস (ই) র পক্ষ থেকে ঐ অঞ্চলে যে সন্ত্রাস চালানো হচ্ছে, তার লিখিত রিপোর্ট দেওয়া হয়। তাও তারা ছাপেন না। যুগান্তর, টেলিগ্রাফ ইত্যাদি সমস্ত কাগজই একযোগে আজ এস. ইউ. সি. আই বিরোধী মিথ্যাপ্রচারে অবতীর্ণ।

এই অবস্থায় প্রকৃত ঘটনা জনসাধারণের সামনে উপস্থিত করা আমাদের একান্ত কর্তব্য বলে মনে করি, যাতে জনসাধারণ নিজেরাই প্রকৃত সত্য ধরতে সক্ষম হন।

গত ১৪ জানুয়ারী কুলতলি থানার চুবড়িঝাড়া অঞ্চলে সিকিরহাটে চ্যারিটি শো'র প্রচার সেরে ঘটিহারানিয়া গ্রামের এস. ইউ. সি. আই কর্মী কমরেড সদানন্দ ঘুঘু, ইব্রাহিম মোল্লা, ইয়ার আলি মোল্লা প্রমুখ যখন বাড়ি ফিরছিলেন, তখন পথে আব্দুর রহমান লস্কর ও আব্দার মোল্লা প্রমুখের নেতৃত্বে দুস্কৃতকারীরা তাদের লক্ষ্য করে গুলি করতে করতে এগিয়ে আসে। গুলির আঘাতে কমরেড সদানন্দ ঘুঘু আহত হয়ে মাটিতে পড়েন এবং ইব্রাহিম মোল্লা ছুটতে গিয়ে পড়ে যান। এই অবস্থায় দুস্কৃতকারীরা তাদের হত্যা করতে উদ্যত হয়। কিন্তু আহতদের আর্তনাদ, দুস্কৃতকারীদের বন্দুকের শব্দ, সঙ্গী ইয়ার আলি'র চিৎকার শুনে পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে অসংখ্য মানুষ ছুটে আসতে থাকে। এইভাবে বিশাল জনতাকে ছুটে আসতে দেখে দুস্কৃতকারীরা পালিয়ে যায়। ডাকাত দলকে যেমন তাড়া করে, তেমনভাবে উত্তেজিত জনতা তাদের পিছু ধাওয়া করে। অবশেষে উত্তেজিত জনতার হাতে দু'জন দুস্কৃতকারী নিহত হয়।

ঘটনা থেকেই সুস্পষ্ট যে, এস ইউ সি আই কর্মীদের হত্যা করার জন্যই কংগ্রেস(ই) দুস্কৃতকারীরা সেদিন আক্রমণ চালিয়েছিল এবং ঘটনাচক্রে জনতার দ্রুত হস্তক্ষেপ না ঘটলে কমরেড মোকাররম খাঁর মতই সেদিন তারা নিহত হতেন, যে ঘটনাটিই জনতার মধ্যে প্রবল উত্তেজনার সঞ্চার করে।

অথচ আব্দুর রহমান লস্কর ও আব্দার মোল্লা প্রমুখের নেতৃত্বে কংগ্রেস (ই) বাহিনী যে এস. ইউ. সি. আই কর্মীদের হত্যার জন্যই সেদিন গুলি চালিয়েছিল, এ ঘটনার প্রতি সংবাদপত্রে কোন গুরুত্বই দেওয়া হচ্ছে না। এর দ্বারাই কি আমাদের বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃত প্রচারের উদ্দেশ্যটি সুস্পষ্ট হয়ে যায় না?

আবার এই ঘটনার সাথে 'এস ইউ সি নারী বাহিনীর নেত্রী' হিসাবে এস ইউ সি আই-এর বিশিষ্ট সংগঠক কমরেড বসুদেব পুরকাইতের স্ত্রী লীলাবতীর নাম যুক্ত করে সংবাদপত্রগুলির প্রচার করছে। অথচ, লীলাবতী গত কয়েক মাস ধরে ঘটনাস্থল থেকে বহু মাইল দূরে বাইশহাটা অঞ্চলে পিত্রালয়ে রয়েছেন। সম্প্রতি সিজারিয়ানের সাহায্যে তিনি সন্তান প্রসব করেছেন এবং এখনও তিনি শয্যাশায়ী। গল্পকথা বানাবার মত্ততায় সাংবাদিকরা শয্যাশায়ী লীলাবতীকে বাইশহাটা থেকে বহু মাইল দূর রাধাবল্লভপুর গ্রামে 'এস ইউ সি'র হামলার নেত্রী' বানিয়ে দিলেন।

আসলে ১৪ জানুয়ারীর ঘটনা ছিল জোতদার কংগ্রেস(ই) চক্রের সুপরিকল্পিত চক্রান্তের অংশ। উল্লেখযোগ্য যে গত বছর ২৪শে এপ্রিল রাতে বোমার আঘাতে নিহত কমরেড বিদ্যাধর হালদার ও রাধাকান্ত প্রামাণিকের হত্যাকারী হিসাবে কুখ্যাত দাগী খুনী জলিল গায়েনকে এস ইউ সি আই কর্মীরা পুলিশে ধরিয়ে দেয়। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে '৮৪ সালের ২৯ মে কংগ্রেস(ই) নেতা শ্রী কুমুদ ভট্টাচার্য ও অরবিন্দ নস্কর ঐ দাগী খুনীর মুক্তির দাবীতে থানায় ডেপুটেশন দেন এবং মিছিল থেকে শ্লোগান ওঠে 'এস ইউ সি কে খতম করো,' 'এস ইউ সি কর্মীদের মুণ্ডু চাই।' এই সংবাদ আমরা সংবাদপত্রে জানাই এবং মুখ্যমন্ত্রীর কাছে লিখিতভাবে পেশ করি। কিছুদিন আগে তাদের আর একজন যুবনেতা বলেছিলেন, 'এই অঞ্চলে যুব কংগ্রেস এস ইউ সি'র বিরুদ্ধে প্রতিরোধ অভিযানে নামবে।' এই 'প্রতিরোধ অভিযান' বলতে তিনি কি বোঝাতে চেয়েছিলেন, সাংবাদিকরা তাঁকে সে প্রশ্ন করলেও তিনি তা ব্যাখ্যা করেন নি। যুব কংগ্রেসের এই 'প্রতিরোধ অভিযান' আসলে কি, তা এই এলাকার মানুষ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছেন।

১৫ জানুয়ারী থেকেই জেলা কংগ্রেস(ই) নেতা শ্রী অরবিন্দ নস্করের নেতৃত্বে শুরু হয় কংগ্রেস(ই)-র তান্ডব। গত ১৫ জানুয়ারী সন্ধ্যায় তিনি, ৭০/৮০ জন মানুষের একটি মিছিল নিয়ে জয়নগর স্টেশন মোড়ে পথসভা করেন। সেখানে তিনি 'প্রবোধ পুরকাইতের মুণ্ডু চাই', 'জিতেন পালকে দেশছাড়া করবো,' '২৪ ঘন্টার মধ্যে এস ইউ সি অফিস পুড়িয়ে দেব' বলে উত্তেজনামূলক বক্তৃতা দেন। সভাশেষে শ্রী অরবিন্দ নস্কর ও আরও কয়েকজনের নেতৃত্বে ঐ মিছিল জয়নগরে এস ইউ সি আই দঃ ২৪ পরগণা জেলা অফিসের ওপর হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করে। কংগ্রেস(ই) নেতার এই আচরণ থেকেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, তারা এস ইউ সি আই-এর বিরুদ্ধে বৃহত্তর আক্রমণ ও সন্ত্রাসের পরিকল্পনা করছে। বাস্তবেও দেখা গেল, কুলতলি ও জয়নগর থানায় ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে চরম সন্ত্রাস শুরু হল। ঠিক এই সময়ই 'আজকাল' পত্রিকায় দু'জন সাংবাদিকের সরেজমিন সংবাদ প্রথম পৃষ্ঠায় বিরাট আকারে প্রকাশিত হল। উদ্দেশ্য হল মানুষের মধ্যে এস ইউ সি বিরোধী মানসিকতা সৃষ্টি করে তার আড়ালে কংগ্রেস(ই)-র হত্যালীলা ও সন্ত্রাসের পরিকল্পিত নৃশংস কার্যকলাপকে আড়াল করা। বাস্তবে ঘটেছেও তাই। কুলতলি কেন্দ্রে নির্বাচিত এস ইউ সি আই সদস্য, সুন্দরবন অঞ্চলে গরীব মানুষের অত্যন্ত

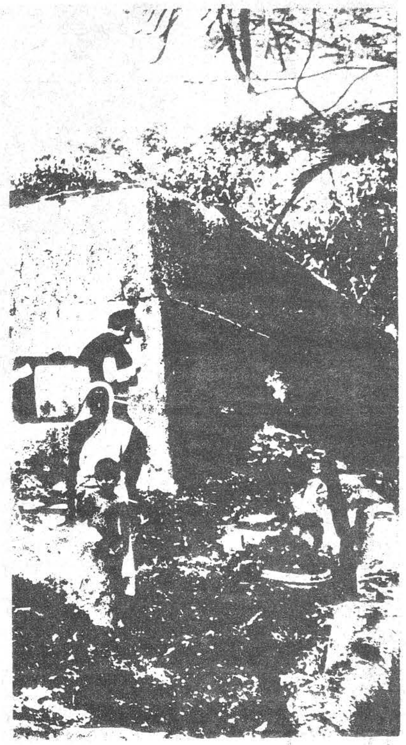

প্রিয়জন কমরেড প্রবোধ পুরকাইতকে হত্যার উদ্দেশ্যে তাঁর বাড়ী আক্রমণ করা হয়েছে। প্রকাশ্যেই কংগ্রেস(ই) শ্লোগান দিচ্ছে 'এস ইউ সি আইকে খতম কর।' 'প্রবোধ পুরকাইতের মুণ্ডু চাই।' সোনাটিকরী ৮নং গ্রামের কমরেড গুরুপদ নাইয়ার বাড়ী পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তার স্ত্রীকে মারধোর করা হয়েছে। বাস্তবে তাদের সন্ত্রাস ও আক্রমণে গোটা অঞ্চলে এস ইউ সি আই কর্মী-সমর্থক ও সাধারণ গরীব চাষী মজুর, নারী-পুরুষ আজ ঘরছাড়া। আমাদের দলের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে রাজ্য সম্পাদক কমরেড সুকোমল দাশগুপ্তের নেতৃত্বে রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যবৃন্দ লিখিতভাবে সমস্ত ঘটনা জানিয়ে এসেছেন। বিভিন্ন সংবাদপত্রের যেসব প্রতিনিধিরা সরেজমিন তদন্তে যাচ্ছেন, আমরা বিনীতভাবে তাদের জিজ্ঞাসা করতে পারি কি, জোতদার কংগ্রেস(ই) চক্রের এসব অত্যাচারের কোন কিছুই তাদের চোখে পড়ছে না কেন এবং এসব তারা প্রকাশ করছেন না কেন? অথচ, সুন্দরবন অঞ্চলে সর্বজনশ্রদ্ধেয় প্রবীণ শিক্ষক, কৃষক ও ক্ষেতমজুর সংঘের পঃ বঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড আমীর আলি হালদারের নামে নারী ধর্ষণের মিথ্যা কুৎসিত অভিযোগ লিখে দিতে তাদের হাত কাঁপল না। এর নাম কি সাংবাদিকতা? আমরা চ্যালেঞ্জ করছি, তারা এই যে কুৎসিত অভিযোগ লিখেছেন, তা প্রমাণ করুন। আমরা আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে প্রস্তুত। অন্যথায় তারা কাঠগড়ায় দাঁড়াতে রাজী আছেন তো? আমরা তাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, এই রাস্তাতেই ফ্যাসিবাদ তার জমি তৈরী করে, কিন্তু যখন সে আসে তখন স্তাবক সংবাদপত্রকেও সে রেহাই দেয়না। ইটালী জার্মানীর ইতিহাস সেই কথাই বলে। □

আবদুর রহমান জনরোষের বলি

– আর এস পি

জয়নগর লোকসভা সদস্য শ্রীসনৎকুমার মন্ডল, পশ্চিমবঙ্গ সংযুক্ত কিষাণসভার সাধারণ সম্পাদক এবং জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি শ্রীঅশোক চৌধুরী বিপ্লবী যুব সংস্থা নেতা শ্রীঅশোক ঘোষ ও ২৪ পরগণার কৃষক নেতা এল খাতের আলি কুলতলি থানার রাধাবল্লভপুর হত্যাকান্ড সম্পর্কে নিম্নোক্ত বিবৃতি দিয়েছেন–

আমরা ৭।২।৮৫ তারিখে কুলতলি থানার রাধাবল্লভপুর, সিকিরহাট, মনিরতট ও সন্নিহিত এলাকাগুলি ব্যাপকভাবে সফর করি এবং বহু প্রচারিত জোড়া হত্যাকান্ডের উৎস ও বিস্তার সম্পর্কে নির্মোহ দৃষ্টি নিয়ে অনুসন্ধান চালাই। যেহেতু ঘটনাগুলি বিচারাধীন সেহেতু বিচারাধীন মামলার বিষয়বস্তু সম্পর্কে কোন মন্তব্য করা আমরা সমীচীন মনে করি না।

আমরা প্রথমে রাধাবল্লভপুরে ডাঃ শ্রীনিবাস রায়ের বাড়ি, নিহত আবদুর রহমান লস্কর ও আবদার মোল্লার বাড়ী গিয়ে ১৫ই জানুয়ারীর ঘটনা ও তার পেছনের কারণ সম্পর্কে অনুসন্ধান করি। তাছাড়া কংগ্রেস, এস ইউ সি ও সি পি এম সমর্থক অসংখ্য লোকের কাছ থেকে ঘটনা সম্পর্কে অভিযোগ ও প্রতি-অভিযোগ শুনি। ঘটনাগুলি সম্পর্কে এ যাবৎ বিভিন্ন সংবাদপত্রে যে সমস্ত বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে তা অনেকাংশই পরস্পরবিরোধি ও অতিরঞ্জিত বলে আমাদের দৃঢ় ধারণা। ঘটনার সূত্রপাত ১৪ই জানুয়ারী সন্ধ্যারাত্রে কংগ্রেস (ই) কর্তৃক এস ইউ সি কর্মী বলে পরিচিত কয়েকজনের ওপর আক্রমণ ও কয়েকজনের নিহত হওয়ার গুজবে সমস্ত এলাকায় তুমুল উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এর পরদিন সকালে দুস্কৃতকারীদের ধরবার জন্য উত্তেজিত জনতা বিভিন্ন বাড়িতে ঢুকে অনুসন্ধান করে, বাড়ী ভাঙচুর করে ও লুটপাট করে এবং ঐ উত্তেজিত জনতার হাতে আবদুর রহমান লস্কর ও আবদার মোল্লা নিহত হয়। নিহত ব্যক্তির রক্তমাখা ভাত তার মাকে খাওয়ানোর প্রকাশিত বিবরণের কোন প্রমাণ আমরা পাইনি; উপরন্তু আবদুর রহমান লস্করের মাও একথা দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করেছেন। ঘটনার সঙ্গে কুলতলি কেন্দ্রের বিধায়ক প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন এমন নিরপেক্ষ সাক্ষ্য পাওয়া গেল না। ঘটনার পরবর্তী সময়ে রাধাবল্লভপুর, ঘটিহারানিয়া, চুপড়িঝাড়া, দেউলবাড়ী, দেবীপুর, মাধবপুর, গোপালপুর, সোনাটিকরী প্রভৃতি গ্রামের বহু বাড়িতে কংগ্রেসিরা ঐ ঘটনার বদলার হিসাবে সঙ্ঘবদ্ধভাবে লুটপাট ও মারধোর করেছে বলে অনেকে আমাদের কাছে অভিযোগ করেছেন। কিছু কট্টর মুসলিমপন্থী এই ঘটনাকে সাম্প্রদায়িক রঙ চড়িয়ে এলাকার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। এমন কিছু ইস্তাহার আমরা ঐ গ্রামে পেয়েছি।

সমস্ত ঘটনাগুলি ভয়াবহ ও মর্মান্তিক। আমরা এই সমস্ত ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত ও প্রকৃত দোষীদের শাস্তি দাবি করছি।

১১।২।৮৫

স্বাক্ষরঃ এল খাতের আলি, অশোক চৌধুরী, সনৎ মন্ডল, অশোক ঘোষ

প্রবোধ পুরকাইত উপস্থিত ছিলেন না

অশোক দাশগুপ্ত

২৪ জানুয়ারি। সকালের ট্রেনে কলকাতা থেকে জয়নগর। সেখান থেকে জীপে রায়দীঘি। রায়দীঘি থেকে ভটভটিয়ায় অর্থাৎ মটরচালিত ডিঙিতে কুলতলি থানার সোমাটুকরি। তারপর ঘটনাস্থলের দিকে পদ যাত্রা। এখান থেকেই তথ্যানুসন্ধান শুরু হয়। চুবড়ি পাড়া, খুটিহারমিয়া, কল্লাতলা, ঝুপখালি, শিকরাপড়া, ভুবনখালি, তেলিপাড়া, রাধাবল্লভপুর প্রভৃতি বিস্তীর্ণ অঞ্চল পরিভ্রমণ করি। অসংখ্য মানুষের সংগে আমাদের দেখা হয়। গ্রামের পথে যেতে যেতেই দেখতে পেলাম কোন বাড়ির দরজা ভাংগা, কোথাও বা দেওয়াল ক্ষতিগ্রস্ত, কোন বাড়ির ছাদের টালি পিটিয়ে ভেঙে দেওয়া হয়েছে আর কোথাও বা দেখতে পেলাম বাড়ির অস্তিত্ব লুপ্ত, এক রাশ ছাই পড়ে আছে। থমকে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেছি সত্যাসত্য নির্ধারণ করতে। কিন্তু কাজটা সহজ ছিল না। মানুষগুলি ভীত, সন্ত্রস্ত। শুরুতে আলাপচারি "হ্যাঁ" "না" "ওরা জানে"তে সীমাবদ্ধ, কিন্তু আমরাও নাছোড়বন্দা। ধৈর্যের পরিক্ষায় উত্তীর্ণ হলাম ওঁদেরই দু-এক জনের পরামর্শে। আমরা জানিয়ে দিলাম যে, আমরা কংগ্রেস বা পুলিসের সংগে যোগসজাগ করে আসিনি। তাতেও মানুষের অস্বস্তির ইতি হয়না কেন বুঝতে পারিনি। পরে ওরাই বুঝিয়ে দিল আমাদের হাতে যে খাতা পেনশিল। তখন আমাদের ঘোষণা না, আমরা সাংবাদিকও নই, পরে জানতে পারি কোন কোন সংবাদপত্রে এই হত্যাকান্ডকে কেন্দ্র করে কাল্পনিক বিভৎস ঘটনার কাহিনীর লোমহর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। সেই সূত্র ধরে জয়নগর, বহরু দক্ষিণ বারাসাত, বারুইপুর থেকে বাবুপার্টির দল তেরাঙা ঝান্ডা নিয়ে দাপাদাপি করে ঝড় তুলেছে আর সেই ঝড়ের দাপটে ঘর জ্বলেছে, লুঠপাট হয়েছে নারীপুরুষ বা হিন্দু মুসলমান ভেদাভেদ না রেখে পাইকারি হারে, বেধড়ক সেক্সফ্রি ও সেকুলার পেটানো হয়েছে। জবরদস্তি সাদা কাগজে "টিপছাপ" নেওয়া চলেছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমাদের ঘোষণায় কাজ হল মনে হল। হঠাৎ বুঝি বা একটা চাপা ফোয়ারার মুখ খুলে গেল। মন উজাড় করে যে যার কথা বলে যেতে লাগলেন। থানায় গিয়ে পুলিশের কোন কর্তাব্যক্তি বা বিবদমান প্রতিপক্ষ কংগ্রেস বা এস-ইউ-সি, কোন দলের অফিসে গিয়ে তাদের কর্তাব্যক্তির সংগে আলোচনা করিনি। যাঁদের সংগে কথা বলেছি তাঁদের মধ্যে অনেক কংগ্রেস কর্মী সমর্থক বা এস-ইউ-সির কর্মী সমর্থক ছিলেন। কেউ সরাসরি পরিচয় দিয়েছেন, বক্তব্য থেকেও কারও কারও পরিচয় জেনে নিতে হয়েছে। এই আলোচনার ভিত্তিতে ঘটনার যে বিবরণ সংগ্রহ করেছি তা এইরকমঃ

ঘটনার সূত্রপাত ১৪ জানুয়ারি রাতে। সদানন্দ, খুখু, ইব্রাহিম মোল্লা, ইয়ার আলি মোল্লাসহ কয়েকজন এস-ইউ-সি কর্মী ঐ দিন সন্ধ্যায় একটি চ্যারিটি শোর প্রচার অভিযানে চুপড়িপাড়া অঞ্চলের সিকিরহাটে যান। প্রচার সেরে ঐদিন রাতে যখন তাঁরা গ্রামের পথে ফিরে যাচ্ছিলেন তখন সমর্থক সদানন্দ খুখুকে এস-ইউ-সি দলভুক্ত অঞ্চল প্রধান বসুদেব পুরকাইত বলে ভুল করে ওদের উপর গুলি চালান হয়। সদানন্দ খুখু মাথায় ছররার আঘাতে মাটিতে পড়ে গেলে ওরা কাছে টর্চলাইটের আলো ফেলে গলা কাটতে গিয়ে নিজেদের ভুল বুঝতে পারে। "এতো প্রধান নয়-কাকে মারতে কাকে মারলাম" বলে আহত সদানন্দ খুখুকে ফেলে পালিয়ে যায়। পায়ে আঘাত পেয়ে জখম হয়েছিলেন ইব্রাহিম মোল্লাও। ইতিমধ্যে গুলির শব্দ, আহতদের আর্তনাদে গ্রামের লোকজন ছুটে আসে। আহতদের কাছ থেকে ঘটনার বিবরণ শুনে আহতদের ব্যবস্থা করে উত্তেজিত জনতা আক্রমণকারীদের খোঁজে বেরিয়ে পড়ে। হাট ফেরৎ লোকের মুখে মুখে ঘটনার বিবরণ ছড়িয়ে পড়ে এবং নিকটবর্তী অঞ্চল থেকেও লোকজন ঘটনাস্থলের দিকে আসতে থাকে, সন্ধান চলতে থাকে আক্রমণকারীদের। রাত বাড়ার সংগে জনসংখ্যা ও উত্তেজনা বেড়ে চলে। অধিক রাতে খবর পাওয়া যায় যে ওরা শ্রী নিবাস ডাক্তারের বাড়িতে লুকিয়ে আছে। জনতা ডাক্তারের বাড়ি ঘিরে ওদের বার করে দেবার দাবি জানাতে থাকে। ডাক্তারের বাড়ি থেকে জানানো হয়, ওরা ওখানে নেই। জনতা ও কথায় বিশ্বাস করে না। সারারাত ধরে চলে দাবি ও অস্বীকৃতি। অধৈর্য জনতা ভোরে দরজা ভেঙে ডাক্তারের বাড়ির খড়ের গাদা থেকে আগ্নেয়াস্ত্রসহ আক্রমণকারীদের খুঁজে বার করে বাইরে নিয়ে যায় এবং পিটিয়ে হত্যা করে। এই দুঃখজনক হত্যাকান্ড যে পরিকল্পিত নয় এবং আক্রমণকারীরা অর্থাৎ আবদার রহমান নস্কর এবং আবদার মোল্লা যে জনরোধের বলি সরোজমিন তদন্তে এটাই আমাদের সিদ্ধান্ত।

যে কথা সংবাদপত্রে সযত্নে গোপন রাখা হয়েছে (কেন জানি না) সেটা হচ্ছে যে সদানন্দ খুখুর উপর গুলি চালিয়ে হত্যার চেষ্টা না হলে পরবর্তী দুটি হত্যাকান্ড ঘটত না। আমরা হত্যা প্রচেষ্টা এবং হত্যাকান্ডকে দ্ব্যার্থহীন ভাষায় নিন্দা করেছি। বিভিন্ন প্রত্যক্ষদর্শীর সংগে কথা বলে এটা আমাদের বিশ্বাস যে হত্যাকান্ডের সময় স্থানীয় এম.এল.এ প্রবোধ পুরকাইত ওখানে ছিলেন না। হত্যাকান্ডের পর তিনি ঘটনাস্থলে পৌছান এবং তার হস্তক্ষেপের ফলেই শ্রীনিবাস ডাক্তার ও অন্যান্য কয়েকজন রেহাই পান।

'ছেলের রক্ত দিয়ে মাকে ভাত খাওয়ানো' 'নারীধর্ষণ' 'নারীনিগ্রহ' 'দেড় মাসের শিশুকে পুকুরে ছুঁড়ে ফেলা এবং উদ্ধার' 'দেড় মাসের ছেলে কোলে অন্তঃসত্ত্বা মায়ের উপর নির্যাতন' ইত্যাদি খবর ছেপে বিভৎস রস পরিবেশন করেছেন যার সত্যের সংগে

তার কোন সম্পর্ক নেই। ঘটনার সম্ভাব্যতা বিচার করলে এটা বোঝা যায়। নিহত ব্যক্তিকে হত্যা করা হয় তার বাড়ি থেকে বেশ কিছু দূরে–তবে মা কি ভাত মেখে বসেছিলেন ছেলের রক্তের অপেক্ষায় না ছেলের রক্ত নিয়ে এসে বসে থেকে ভাত রান্না করে মাকে খাওয়ানো হয়েছে? দেড় মাসের শিশু সন্তানকে পুকুরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে জীবন্ত উদ্ধার সম্ভব কি? আর দেড় মাসের শিশুর মা অন্তঃস্বত্বা হতে পারেন কিনা সেটা চিকিৎসকদের গবেষণার বিষয় যা "হলুদ" সাংবাদিকতার নিদর্শন।

এই ঘটনার সূত্র ধরে ১৯ জানুয়ারি থেকে উপদ্রুত এলাকা সম্প্রসারিত করে নিয়ে কংগ্রেসের তরফে শুরু হয়েছে বদলা নেওয়া। ব্যাপক সন্ত্রাস সৃষ্টি করে অগ্নিসংযোগ, লুঠতরাজ, জবরদস্তি সাদা কাগজে 'টিপ ছাপ' নেওয়া, প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক কর্মীদের খুঁজে বার করবার অছিলায় সাধারণ মানুষের উপর অকথ্য নির্যাতন অবাধে চালানো হচ্ছে। এক কথায় এই খুনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস গোটা এলাকায় রাজনৈতিক প্রভুত্ব বিস্তারের খেলায় মত্ত বহরু অঞ্চলের জনৈক কংগ্রেস নেতার নেতৃত্বে। এমন কি স্থানীয় কৃষি ঋণদান সমবায় সমিতির অফিস ভাঙচুর করে তার খাতাপত্র রেকর্ড শুধু নয়, আসবাব গুলিও লুঠ হয়ে গেছে।

সি.পি.এম-এর কোন সংগঠন ওখানে নেই। লোকে বলে এই ব্যাপারে তারা কংগ্রেসকে সমর্থন করছে। সে জন্যই কি এখনও বল্গাহীনভাবে এই অত্যাচার চালিয়ে যেতে দেওয়া হচ্ছে? কোন পুলিস প্রশাসন সেখানে আছে বলেও মনে হয় না। বামফ্রন্ট রাজত্বে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার আর এক কীর্তি কুলতলি।

প্রদেশ কংগ্রেস সম্পাদক সন্তোষ রায় আমাদের রিপোর্টকে একতরফা বলেছেন। সঙ্গত কারণেই মনে হয় যে একতরফা কথাটির অর্থ সম্পর্কে তিনি সম্যক অবহিত নন। কোর্ট কাছারিতে ২ পক্ষের মধ্যে বিবাদ হয়। সে ক্ষেত্রে 'একতরফা' কথাটির প্রয়োগ হয়–যখন অপর পক্ষকে না শুনে কোন বিচার শেষ করে দেওয়া হয়। আমরা তো কোন কোর্ট বসাইনি আর আমাদের সামনে কোন বাদী বা বিবাদীও ছিল না। আমরা সত্য ঘটনা জানা ও বোঝার জন্য প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী ও বিশিষ্ট আইনজ্ঞ দ্বিজেন্দ্রলাল সেনগুপ্তর নেতৃত্বে কুলতলির বিস্তীর্ণ অঞ্চল দীর্ঘ সময় পরিভ্রমণ করে, দলমত নির্বিশেষে অসংখ্য মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি এবং তাদের বক্তব্য শুনি। কংগ্রেস ও এস-ইউ-সির এই বিবাদে তাদের বিবাদমান পক্ষ হিসাবে যদি ধরা হয়–আমরা তো বিবাদমান দুপক্ষের কোন পক্ষই নই। তাই সন্তোষ বাবুর চেয়ে নিজেদের আমরা অনেক বেশি নিরপেক্ষ বলে মনে করি। এই জাতীয় তদন্তে কোন নির্দিষ্ট পদ্ধতি থাকে না, সম্ভবও নয়। এক এক অবস্থায় এক এক রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। তদন্তের ক্ষেত্রে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে তা স্থির করবার অধিকার বিবাদমান কোন পক্ষেরই নেই। একদল মামলাবাজ লোক যার নিজেদের পক্ষে মামলার রায় না হলেই বিচারকের নিরপেক্ষতা, পারদর্শিতা ও সততায় সন্দেহ প্রকাশ করেন। সন্তোষবাবু কি তাদেরই একজন? □

লেখকের চিঠি

বললুম, কত আর? ত্রিশ? পঁয়ত্রিশ?

চল্লিশের একদিন কম নয়। প্রৌঢ়া কোন রমণীকে গদগদ গলায় কবিতা প'ড়ে শুনিয়েছেন কোনদিন? বলেছেন তার চোখের অতল কালোয় আপনার মৃত্যু? ব'লে দেখবেন। তার মুখ-চোখের রঙ- বদল হয় কি না লক্ষ্য করবেন।

বলতে বলতে পরিমল উঠে দাঁড়াল। চেয়ে দেখলুম, ওর হাতে জ্বলজ্বল করছে সেই আংটি।

সেই থেকে আমি কেবল এই ভাবছি। পরিমলের কথা ঠিক হ'লে এ গল্পের আসল আসামী বয়স। অন্ততঃ একজনের চোখে এখনও সে তরুণী, এইটুকু যাচাই করতে গিয়েই কি তবে মৃণাল মরল? বিশেষ একটা বয়সকে বেঁধে রাখার পাগলামি কি এই বয়সে আসে? তার জন্যে কি কেউ এত দাম দেয়, এমন ক'রে ঠকে? কী জানি। মৃণাল তো ব্যতিক্রমও হতে পারে!

তাই ঠিক করেছি, সম্পাদক মশাই, গল্পটা ফিরেই লিখব। যদি সময় থাকে, তবে লেখাটা পত্রপাঠ ফেরত পাঠিয়ে দিন। □

[পুনর্মুদ্রিত]

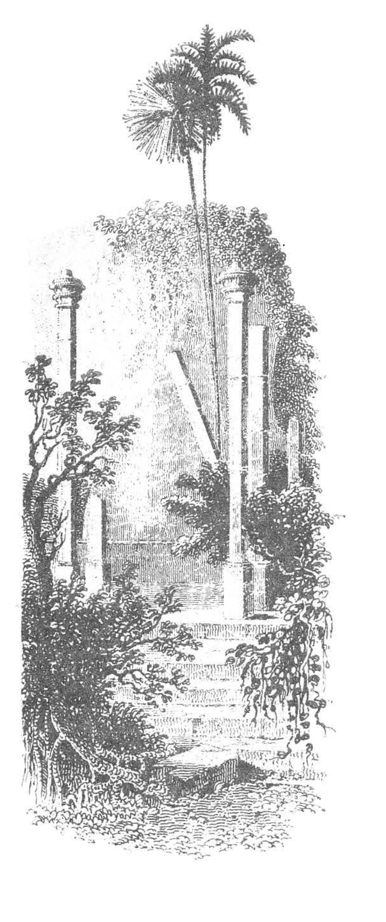

প্রিয়জনের জন্য শ্রেষ্ঠ উপহার

পল্লী অঞ্চলের অভাবী মানুষের
হাতে কাটা, হাতে বোনা

ভাণ্ডার: নেতাজি মার্কেট, মালদা
কমার্সিয়াল মার্কেট, রায়গঞ্জ
দেশবন্ধু রোড, রামপুরহাট
জলঙ্গি, মুর্শিদাবাদ

গান্ধী গ্রাম বিকাশ সমিতি
খাদি ও গ্রামোদ্যোগ কমিশন
কর্তৃক স্বীকৃত
২নং গভর্ণমেন্ট কলোনি, মুকদুমপুর
মালদা, ফোন–২৫৩২

রেশম, মটকা, গরদের শাড়ি, সার্টিং
মসলিন খাদির ধুতি, সার্টিং

চাকিতে তৈরি মালদার
বিখ্যাত সোনামুগের ডাল,
ঘানির সরষের তেল

ভারতের সর্বত্রই পাবেন

ধারাবাহিক

মরজি মহল

বনফুল

।। ২৪ আগস্ট ১৯৭৫ ।।

রবিবার আজ এসেছে কবু
দু'চার লাইন লিখিব তবু
আনন্দ আজ এসেছে খোদ
এসেছে মুর্গি, উঠেছে রোদ
একটি দুঃখ কেবল হায়
লীলা শুয়ে আছে বিছানাটায়
চলতে পারে না কয় না কথা
ছিল যে বৃক্ষ হয়েছে লতা।
এলিয়ে পড়েছে নেইকো জোর
কাঁদছে দিবস রাত্রি ভোর
দুঃখ-বাঘের পিছনে কেউ
লাগছে তবুও আসছে ঢেউ
নানান সুখের নানান সুর
এতেই দুঃখ হবে কি দূর ?

আজ কাগজে দেখলাম অমলদা (অমল হোম) মারা গেছেন। অনেকদিন ধরে ভুগছিলেন, মুক্তি পেলেন। জীবন্মৃত হয়ে ছিলেন এতদিন।

কি আশ্চর্য, বেলা একটার পর মেঘে ছেয়ে গেল আকাশ। তারপরই বজ্র-বিদ্যুৎ-সহ শুরু হয়ে গেল মুষলধারা বর্ষণ।

আজ কলকাতার জন্মদিন। ২৮৫ বছর আগে জব চার্ণক কলকাতার জন্ম দিয়েছিলেন।

।। ২৫ আগস্ট ১৯৭৫ ।।

কাগজ খুললেই বানের খবর। আর খবর ইন্দিরাজীর। তিনি ইমার্জেন্সি চালু করে দেশের যে কত উপকার করেছেন তারই ফর্দ। দৈনন্দিন জিনিসের দাম কিন্তু কিছু কমেনি। আজ একটি ডাব কিনলাম ৮০ পয়সায়। আজকের আর একটা খবর রাশিয়া বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে।

সকাল থেকে ছিল বেশ গুমোট
দশটা নাগাদ বৃষ্টি হল একচোট
খালি গায়ে জলের ছাটে ভিজলাম
খানিক ভিজে পেলাম একটা আরাম।
কাক শালিক ছাড়া অন্য পাখীর সাড়া
পাচ্ছি না কোথাওঃ পাড়াটা নিঝঝুম
দর্জি পাখী ডাকত আগে সে-ও এখন গুম।
দোয়েল কোকিল ডাকছে না, নীরব বুলবুলি
সন্তর্পণে খুলে তবু কল্পনা-ঘুলঘুলি
চেষ্টা করলাম দেখতে বিরহিণী রাধাকে
দেখতে পেলাম কয়েকটা রোগা ভিজে গাধাকে
সর্বাঙ্গ ভিজে গেছে পায়ের নীচে কর্দম
সারা গায়ে বসছে মাছি ল্যাজ নাড়ছে হর্দম
মনে মনে হয়েছিলাম কাব্য নিয়ে তৎপর,
'মেঘদূত' হায় কিন্তু হল' মোহমুদ্গর ।

।। ২৬ আগস্ট ১৯৭৫ ।।

আবার বাল্মীকি রামায়ণ পড়তে শুরু করেছি। একটা কথা মনে হচ্ছে যে ক্রৌঞ্চ-বধ দেখে বাল্মীকির মুখ থেকে প্রথম শ্লোক নির্গত হয়েছিল তা কি আমাদের কোঁচবক ? বর্ণনা থেকে মনে হয় পাখীটা একটু বড় গোছের। তারা সুমধুর স্বরে গান গাইতে গাইতে ছুটোছুটি করছিল প্রণয়-লীলায় মেতে। তাদের মাথায় তাম্রবর্ণ একটি টুপি মতন আছে। আমাদের কোঁচবকের সঙ্গে মিলছে না। মনে হয় কালো মুন্ডক (Black I bis) হতে পারে। বাটান কিম্বা Tern (যাকে আমরা গাংচিল বলি) তাও হওয়া সম্ভব। রামায়ণের বর্ণনা থেকে ওকে কোঁচবক মনে হয় না।

ভাদ্রমাসে সূর্য সিংহরাশিতে থাকে। সে জন্য মেঘগর্জন সিংহগর্জনের তুল্য হয়। আজ সকালে সে সিংহনাদ শুনলাম বার কয়েক।

কাক বক বাবুই শালিক
সবাই নিজের বাসার মালিক
　　বাসা-ভক্ত সব রকম বিহঙ্গ
কিন্তু কেউ ট্যাকস্ দেয় না—কি রঙ্গ !
　　করপোরেশন নেই
আমাদের সঙ্গে ওদের তফাৎটা তো এই।

।। ২৭ আগস্ট ১৯৭৫ ।।

আজ কাগজের খবর

(১) পাটনা বানে ডুবুডুবু-হেলিকপটারে মিলিটারি নেবেছে সাহায্যার্থে
(২) শান্তিভূষণ বলেছেন-৩৯তম সংশোধন আইনের বিরোধী। লম্বা বক্তৃতা করেছেন। অশোক সেনের বক্তৃতা এখনও বের হয় নি।
(৩) ডায়াস সাহেবের নেতৃত্বে বাংলাদেশের উপাচার্যগণ এবং আমাদের মুখ্যমন্ত্রী শিক্ষাকে অনাচার-মুক্ত করবার জন্য বদ্ধপরিকর।

অনেক রকম প্রস্তাব কাগজেতে বেরোয়
　　কার্যে কিন্তু নেয় না কেউ রূপ
হাটে করি হট্টগোল সবাই
　　ঘরে এসে চুপ

সকালেতে কাগজেতে পড়ি নানা খবর
তাই নিয়ে খানিকক্ষণ করি নপরচপর
সন্ধ্যা নাগাদ সব আবার পড়ে যায় চাপা
পরের দিন নূতন খবর হয় ফের ছাপা
তা-ও পড়ে হই মোরা উতলা উম্বাহু
কখনও বা খুশী হই কভু করি হা হু
এই ধারা শেষে মোদের ভাসিয়ে নেবে কোথা
এ নিয়ে আমরা কেউ ঘামাই না তো মাথা।
আপিং-খোর নই মোরা কাগজ-খোর সব
পূজাতেও করি মোরা কাগজ উৎসব।
সে উৎসবে উপাদান রিরংসা, শৃঙ্গার
ভ্যাপসা পচা কামরসে ভরতি ভৃঙ্গার।

।। ২৮ আগস্ট ১৯৭৫।।

আব্দিস আবাবা রেডিওর খবর
হাইলে সেলাসি মারা গেছেন।
আজকাল আর জোব্বার যুগ নেই
সব চোংপ্যান্ট আর হাফশার্ট হয়ে গেছে।
ইথিওপিয়ার প্রাক্তন সম্রাটও
সম্রাট থাকতে পান নি শেষ পর্যন্ত।
সামরিক অভ্যুত্থান
গদি-চ্যুত করেছিল তাঁকে।
তিনি প্রায় অর্ধশতাব্দী কাল
সম্রাট ছিলেন।
শেষ জীবন কাটল বন্দী অবস্থায়।
বয়স হয়েছিল ৮৩
মৃত্যুর কারণ নাকি Prostate।
মনে পড়ছে গানের সেই ছত্রটা
এসেছ ল্যাংটা যাইবে ল্যাংটা
মাঝখানে শুধু গন্ডগোল।
এই সম্রাট হাইলে সেলাসিকে
একদা বিধ্বস্ত করেছিল
যে ইতালীর ডিক্টেটার মুসোলিনি।
সে-ও আজ নেই
তার মৃত্যু আরও শোচনীয়।
কিন্তু এসব উদাহরণ
নিরস্ত করবে না ভবিষ্যৎ ডাকাতদের-
এইটেই মজা।
দৈত্য বংশ নির্মূল হয় না
কারণ তারাও প্রজাপতির সন্তান।

।। ২৯ আগস্ট ১৯৭৫।।

উঠেছি আজ অনেক বেলায়
তারপর ক্রমাগত জনসমাগমের ঠেলায়
ক্লান্ত হয়ে পড়লাম।
অনেকক্ষণ লড়লাম
প্রায় বারোটা তক্
এমন সময় পুতুল করলে 'নক্'
বাবা চান করুণ, একটার সময় খেতে হবে
তিনটের সময় রক্ত দিতে যেতে হবে
বনবিহারী বাবুর বাড়ি।
উঠে পড়লাম তাড়াতাড়ি।
রক্ত দিয়ে এলাম
চোখ দেখিয়ে এলাম
নতুন চশমা করাতে দিলাম
বাড়ি ফিরলাম
তখন পাঁচটা হয় হয়
তিস্তাকে নিয়ে হুড়োমুড়িতে গেল কিছু সময়
তারপর লীলাকে নিয়ে ছাদে গেলাম
তাকে খানিকক্ষণ হাঁটালাম
গৌরের মা, অর্জুনের সহায়তায়
লক্ষ্য করলাম ভাদ্রের সন্ধ্যায়
মেঘে চমৎকার রং লেগেছে
প্রকৃতির থিয়েটারি ঢং জেগেছে
প্রমাণ পেলাম আর একবার
আমাদের সুখে-দুঃখে প্রকৃতি নির্বিকার।

।। ৩০ আগস্ট ১৯৭৫।।

মহান স্বদেশ প্রেমিক নেতার মৃত্যু-সংবাদ পেলাম আজ কাগজে। ডি. ভ্যালেরা ৯২ বছর বয়সে মারা গেলেন। তাঁকে আমরা আপন লোক মনে করতাম। তিনি যখন ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে নিগৃহীত হচ্ছিলেন আমরাও তখন হচ্ছিলাম। তিনি জেল থেকে পালিয়ে ফাঁসি-কাঠ এড়িয়েছিলেন আমাদের অনেক নেতা তা পারেন নি। অনেক হীরের টুকরো ছেলে ফাঁসিকাঠে ঝুলেছিল বন্দেমাতরম মন্ত্র আবৃত্তি করতে করতে। তাদের কথাই মনে পড়ছে ডি. ভ্যালেরা ভাগ্যবান। তিনি স্বাধীনতার জন্য লড়েছিলেন, সে স্বাধীনতা পেয়েছিলেন, স্বাধীন দেশের প্রধানমন্ত্রীও প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের ক্ষুদিরাম, কানাইলাল, ভগৎ সিং, যতীন মুকুজ্যে, সূর্য সেন, সুভাষ বসু, বিনয়-বাদল-দীনেশরা শুধু কষ্টই পেয়ে গেলেন। তাঁদের দুঃখ আমরা ক্রমশ ভুলে যাচ্ছি। আজকালকার ছেলেরা তাঁদের জীবনচরিতও জানে না। তারা ব্যস্ত কোন অভিনেত্রীর কোথায় কটা তিল আছে সেই খবর সংগ্রহ করবার জন্য। আর কয়েকটা হতভাগা কাগজ সে সব খবর সরবরাহও করে যাচ্ছে।

হে মধুসূদন
কবে হবে এদেশেতে নচ্ছার নিধন।

।। ৩১ আগস্ট ১৯৭৫।।

প্রথম খবর

এ কি অনাসৃষ্টি
সকাল থেকেই বৃষ্টি
আকাশ থেকে মুছে গেল
সূর্যদেবের কৃষ্টি
বন্ধ জানলা বন্ধ দুয়ার
চতুর্দিকে অন্ধকার
ভিজে কাক ডাকছে খুব
বুলবুলিরা মারল ডুব
হারিয়ে গেল দোয়েলপাখীর শিস্‌টি।
সকাল থেকেই বৃষ্টি।

দ্বিতীয় খবর

বেড়েছে Blood Sugar
বনবিহারী ডাক্তার

করেছেন আদেশ জারি
মিষ্টি কর বন্ধ
বাড়াও ইন্সুলিন
রক্ত লইব 'ফিন' (আবার)
এক পক্ষ পরে পুন
করিও না সন্দ
কল্পনায় তাই
ভুয়ো রসগোল্লা খাই
আর পাই অবাস্তব
জিলিপির গন্ধ
অর্থাৎ রোগে লোভে
চলিয়াছে দ্বন্দ্ব।

।। ১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫ ।।

কাগজে খবর নেই তেমন। ফলাও করে আছে খেলার খবর আর বানের খবর। আর বিদেশের খবর যার সঙ্গে আমাদের প্রাণের যোগ নেই। আকাশে রোদ বৃষ্টির খেলা চলছে একঘেয়ে। বানে অনেক লোক মরেছে, অনেক লোক নিঃস্ব, গৃহহারা। এইবার শ্রাদ্ধ হবে। টাকার শ্রাদ্ধ। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী দশ কোটি টাকা চেয়েছেন। কিন্তু অত কম টাকায় হবে কি? মিশ্র মশাই খুব হিসেবী লোক মনে হচ্ছে। মাত্র দশ কোটি!

এদেশে তো ছোট মাপের
কিছু নেই।
সেকালে হত রাজসূয়, অশ্বমেধ
বই লেখা হত
রামায়ণ মহাভারত
দুর্ভিক্ষে লোক মরত কোটি কোটি।
এত বড় বানে
এত বড় পাটনা শহর নিমজ্জিত
আর মিশ্র মশাই চাইছে
মাত্র দশ কোটি।
ছ্যা—ছ্যা—।

।। ২ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫ ।।

কাগজ পড়ে যতটুকু বুঝলাম
অ্যাটর্নি জেনারেল শ্রী নীরেন দে
প্রাধান্য দিয়েছেন জনমতকে
আইনকে নয়
তাঁর মতে গণতন্ত্র জনতারই তন্ত্র
সে তন্ত্রে জনতারই হবে জয় জয়
জনতারই প্রতিভূ সংসদ
জনতার প্রিয় নেত্রী ইন্দিরাকে বাঁচাতে
নিশ্চয়ই আইন হবে রদ
ইন্দিরা থাকবেন—জনতার মর্জি
সেই মাপের আইন—ফতুয়া
বানিয়ে দিক দর্জি।

ভট্টাচার্যের শাদা গোলাপ অনেক ফুটেছে
হাওয়া বইছে দক্ষিণী আর রোদও উঠেছে
মনটুজামা গ্র্যান্ড মোগল
এরাও হাসছে
রূপের মনটিও ভাসছে
মনকে শুধাই ভাসতে ভাসতে
যাবি রে কদ্দূর

মন বললে মুচকি হেসে
সোনা লক্ষ্মীপুর।

।। ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫ ।।

ছেলেমেয়েরা হোটেলে কিভাবে থাকে তারই বিস্তৃত আলোচনা প্রকাশ হয়েছে একটা বিখ্যাত দৈনিকে। দেখলাম আমাদের সময়ে যেমন ছিল এখনও তেমনি আছে। এ আলোচনা পড়ে কি লাভ হবে কারও। কাগজ বাজারে দুর্মূল্য তার এমন অপব্যায় কি উচিত?

আমাদের দুর্ভাগা দেশে ভালো কাগজ দু'একটা যা-ও আছে তা আমাদের নজরে পড়ে না। তারা দরিদ্র। 'সংহতি' 'কম্পাস' 'কথা সাহিত্য' 'যষ্টিমধু' সুখপাঠ্য। কিন্তু ভালো প্রচার নেই।

যেগুলি সুপ্রচারিত সেগুলি সুবিজ্ঞাপিত বড়লোকের রক্ষিতার মতো সদর্পে মোটর দাপিয়ে চারদিকে ঘুরছেন।

ভেড়ার পাল গরুর পাল
তোদের সব পোড়া কপাল।
মরু ভূমিতে করিস বাস
পাস না ঘাস বালিই খাস।
তাই খেয়েই নাড়িস শিং
আর নাচিস্ তিড়িং তিং।

।। ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫ ।।

ঋণগ্রস্ত চাষীদের ঋণ মকুব করা হচ্ছে, দুর্নীতি দমন করবার নানা চেষ্টা চলছে, দেশে শিল্পোন্নয়নের চেষ্টাও চলছে বহুরকম, এমন কি শস্তা মাছের দোকানও খুলেছেন সরকার। এক কে. জি ওজনের মাছ থেকে আধ কে. জি মাছ পাওয়া যাবে ৫ দরে। বন্যা-পীড়িতদের সাহায্যের জন্য প্রচুর খরচ করছেন সরকার। তবু অনেকের মনে সন্তুষ্টি নেই। কারণ, সকলকে সন্তুষ্ট করা যায় না। ভারতে গণতন্ত্র আছে কি নেই এ নিয়ে অনেক বিদেশী শক্তি বড্ড বেশী মাথা ঘামাচ্ছেন।

পরনিন্দা পরচর্চা করি মূলধন
ব্যবসা করেন যাঁরা তাঁরা দুর্জন?
তাঁহাদের কথা শুনে করিও না নৃত্য
স্বদেশকে ভালবেসে রও দৃঢ়চিত্ত।
আমাদের ভালো মন্দ আমাদেরই থাক
তার মাঝে যাঁরা ভাই
গলাইছে নাক
ধোয়া তুলসী পাতা তারা নহে জেন কেহ
কাহারও বা বাগী আছে।
কাহারও প্রমেহ।

।। ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫ ।।

কোথা থেকে আসছে ফুলের সুগন্ধ
কোথা থেকে আসছে ভেসে সুর রে
কোথা থেকে আসল এত আনন্দ
প্রাণ মন হল যে ভরপুর রে।
যাচ্ছি ভেসে যাচ্ছি ভেসে
তরতরিয়ে যাচ্ছি ভেসে
কোথা যাচ্ছি কেন যাচ্ছি
জানতে মন চায় না
কোথায় লগি কোথায় হাল

কেউ যে থই পায় না।
তোরাও যদি সঙ্গে যাবি
আয় না
আসতে কেউ চায় না।

।। ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫ ।।

আজ বিকেলে দু-জায়গায় সভা ছিল। বেথুন স্কুলে মেয়েরা শরৎজন্মশতবার্ষিকী উৎসব পালন করছিলেন। সেখানে গিয়েছিলাম। একটি মেয়ে শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পড়ল। বেশ ভালো প্রবন্ধ। আর একটি মেয়ে শরৎচন্দ্রের লেখা থেকে আবৃত্তি করল খানিকটা। সেটাও বেশ ভাল লাগল।

ছাত্রীদের এবং শিক্ষিকাদের ব্যবহার অনিন্দনীয়।
বেথুন স্কুলেই ৫টার সময় গাড়ি এল।
লেকটাউনে আনুষ্ঠানিকভাবে থানা-উদ্বোধন হচ্ছে। সেখানেও যেতে হবে। ও. সি. গাড়ি পাঠিয়েছেন। গিয়ে দেখলাম-পুলিশ বিভাগের বড় বড় কর্তারা এবং চীফ সেক্রেটারি বিনয়রঞ্জন গুপ্ত সেখানে রয়েছেন। অনেকে বক্তৃতা করলেন। আমিও একটু করলাম।

আমরা সাতাশ বছর স্বাধীনতা পেয়েছি। কিন্তু এখনও স্বাধীনতার মর্ম বুঝি নি। যতক্ষণ আমরা দেশের ভালোমন্দকে নিজের ভালোমন্দ বলে গণ্য করতে না পারব, যতদিন আমরা মনে করব গভর্নমেন্ট আমাদের শাসক এবং আমরা নিপীড়িত প্রজামাত্র ততক্ষণ আমাদের স্বাধীনতা আমাদের কাছে অর্থহীন হয়ে থাকবে।

।। ৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫ ।।

আজও বিকেলে শ্যামবাজারে আমরা সবাই ক্লাবে গিয়েছিলাম শরৎজন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে। অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ও গিয়েছিলেন। অনেকদিন পরে ভাগলপুরের তরুর সঙ্গে দেখা হল সে সভায়। দেখলাম তরুর চুল পেকে গেছে।

আকাশে কাদা ছুঁড়লেও
লাগে না তার গায়ে
সে অনেক উঁচুতে থাকে
তাই সে নির্মল।
আমরা অনেক নীচে থাকি
তাই কাদা আমাদের গায়ে লাগে
আর আমরা হায় হায় করি।

বহুকাল পরে কাল ওল-ভাতে খেলাম। খুব ভালো লাগল। প্রত্যহ আলু খেয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম।
মৃত্যুই একঘেয়ে
বৈচিত্র্যই জীবন।

।। ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫ ।।

কাগজে দেখলাম তুরস্কে ভীষণ ভূমিকম্প হয়ে প্রায় তিন হাজার লোক মারা গেছে। এদেশে ভীষণ বান তো চলছেই। ভীষণ ঝড়ের খবর এখনও পাই নি।

কিন্তু ভূমিকম্প, বন্যা যাই হোক আমাদের একটি দৈনিক পত্র রোজ কিছু না কিছু যুবতী মেয়েদের ছবি ছাপবেই। এমন মেয়ে-ন্যাকরা কাগজ পৃথিবীতে আর কোথাও আছে কি না জানি না। আর একটি বাংলা কাগজের বিশেষত্ব সেখানে কোনও না কোনও ছুতোয় কাগজের মালিকের ছবি ছাপা হবেই। আর একটি ইংরেজী কাগজ বিদেশী খবর নিয়েই মশগুল। দেশী খবর কম ছাপেন।

বলুন এখন কোনটা বাছি-
জলে কুমির ডাঙায় বাঘ
গাছের উপর মৌমাছি।

ইন্দিরাজীর পক্ষে অ্যাটর্নি জেনারেল শ্রীযুক্ত নীরেন দে যে সব যুক্তি দেখাচ্ছেন সুপ্রীম কোর্টে তাতে মনে হয় ইন্দিরাজী জিতবেন। অ্যাডভোকেট জেনারেলের যুক্তিও বেশ জোরালো।

শান্তি ভূষণ করছেন বৃথা রোদন
হলে প্রয়োজন সব আইনই করতে হয় সংশোধন।
দরকার হলে ভোম্বলকে সীতা সেজে কানতে হয়
ক্ষেত্রজ পুত্রকেও পুত্র বলে মানতে হয়।

।। ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫ ।।

বান আর ভূমিকম্পের খবর তো আছেই, আজ খবর বেরিয়েছে, ঝড়ও নাকি আসন্ন। গ্রীষ্মকালের জ[illegible] আর অগ্নিকান্ড তোলা আছে। শীতেও অনেকে জমে মারা যায়। তাছাড়া মহামারী, অনাহার, অপুষ্টি, জরারোগ্য ব্যাধি, এসব তো আছেই। আর আছে যুদ্ধ, পরস্পর হানাহানি। এসব সত্ত্বেও আমরা আজও নিঃশেষ হইনি। টিঁকে আছি। আর আমাদের সঙ্গে টিঁকে আছে অসংখ্য মশা, মাছি, টিকটিকি, গিরগিটি, আরশোলার দল। শুয়োর গরু গাধা ভেড়ার পাল।

বেশী সভ্য হলেই সর্বনাশ
প্রকৃতি করে দেবে গর্ব-নাশ
বেশী সভ্যতা তিনি সইতে পারেন না
গপ্ করে করে ফেলেন গ্রাস।
আমরা এখনও অসভ্য জানোয়ার
তাই সইতে পারছি প্রকৃতির মার
অনেক সভ্য মানুষ সভ্য প্রাণী, সুন্দর পাখী
প্রকৃতি শেষ করছে এনতার
সুতরাং বাঁচতে যদি চাও হে নরবর
হও অসভ্য বর্বর।

সাংবাদিক হরিশচন্দ্র ও নীল আন্দোলন

অরুণ মুখোপাধ্যায়

শ্রদ্ধেয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার সাংবাদিক হরিশচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে লিখেছিলেন, হরিশচন্দ্র লক্ষ লক্ষ নরনারীকে অকাল মৃত্যু হইতে, শ্মশান হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। এইজন্য হরিশচন্দ্রের ভারত-হিতৈষী নামের সার্থকতা হয়।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এদেশের দেওয়ানীর দায়িত্ব নিয়ে নীল চাষের ব্যবস্থা করেন। এক সময় বাংলা থেকে ইয়োরোপে এক কোটি থেকে চার কোটি টাকার নীল রপ্তানী করা হত। ইন্ডিগো কমিশনের রিপোর্টে জানা যায়, যশোর নদীয়া জেলার নীল ছিল সেরা নীল।

নীল চাষ লাভজনক ছিল। প্রচুর টাকার নীল রপ্তানী হত। ১৮২৩ সালে সরকার নীলকরদের অনুকূলে ছয় আইন জারী করেন। ১৮৩০ সালে নীলের চুক্তি ভঙ্গের ব্যাপারে, পাঁচ আইনে কারাদন্ড বিধিবন্ধ হয়। এই আইন ১৮৩৬ সালের দশ আইনের বলে বাতিল হয়ে যায়। আবার দশ আইনে কেউ ইচ্ছে করে নীল চাষের ক্ষতি করলে জরিমানা ও কারাদন্ড উভয়েরই ব্যবস্থা রাখা হয়।

নীলের চাষ প্রজাদের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিজনক ছিল। গরীব চাষীদের জোর করে নীলের দাদন দেওয়া হত, আর এই দাদন একবার নিলে প্রজারা চার পুরুষ ধরেও শোধ দিতে পারত না। নীলচাষীকে নীলচাষের খরচ দিতে হত, নীল গাছ কেটে গরুর গাড়িতে বোঝাই করে নীল কুঠিতে পৌঁছে দিতে হত। এইসব কাজের কোন পারিশ্রমিক দেওয়া হত না। নীলকর সাহেবরা প্রজাদের চাষের ফসল জোর করে কেড়ে নিতেন।

ধানের জমিতেই নীলের চাষ ভাল হত। গরীব চাষীরা ধানের জমিতে নীল চাষ করতে চাইত না। নীলকর সাহেবরা গোমস্তাদের সাহায্যে নীলচাষীদের ধরে এনে তাদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার চালাত।

বারাসত জেলার জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট অ্যাসলি ইডেন গরীব চাষীদের উপর নীলকর সাহেবদের ভয়াবহ অত্যাচার লক্ষ্য করে ১৮৫৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এক আইন জারী করেন। তিনি এই আইনে নির্দেশ দেন, নীলকর সাহেব যদি কোন প্রজার চাষের জমিতে জোর করে নীল চাষ করবার চেষ্টা করে, ম্যাজিস্ট্রেট সেই নীল করের বিচার করবেন। প্রজারা এই আইন জারীর পর নীল চাষ করতে রাজী হয় না। বারাসতের চাষীরা প্রথমে নীল চাষ বন্ধ করে। এরপর যশোরের চাষীরা নীল চাষ বন্ধ করে দেয়। নীলকররা এবার দল বেঁধে ইডেনের বিরুদ্ধে ছোট লাটের কাছে নালিশ করে। ছোট লাট গ্রানট সাহেব ইডেনকেই সমর্থন করলেন। এরপর নীল বিদ্রোহের সূচনা হয়। একদিকে পাবনা, নদীয়া, যশোর, বারাসত, বিভিন্ন জেলার লক্ষ লক্ষ নীল চাষী অন্যদিকে ধনী নীলকররা। বাংলার অনেক বড়বড় জমিদার গরীব নীল চাষীদের সমর্থন জানায়।

নীলচাষ সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য এক কমিশন বসল। এই কমিশনের নাম ইন্ডিগো কমিশন। হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই ইন্ডিগো কমিশনের সামনে জবানবন্দী দিয়ে গরীব নীল চাষীদের উপকার করেছিলেন। ১৮৬০ সালের ৩০শে জুলাই ইন্ডিগো কমিশনের সামনে হরিশচন্দ্র জবানবন্দী দেন। কমিশনের সভাপতি ডব্লিউ. এস. সিটনকার। সভ্য চারজন আর. টেম্পল, ডব্লিউ. এস. ফার্গুসন, জে. সেল, চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়। সিটনকার ও টেম্পল ছিলেন সরকারের প্রতিনিধি, জমিদার ও নীল চাষীদের প্রতিনিধি ছিলেন চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়।

সভাপতিমশাই হরিশচন্দ্রকে প্রশ্ন করেন, আপনি কি কাজ করেন? হরিশচন্দ্র জানালেন, তিনি মিলিটারি অডিটর জেনারেল অফিসের এক কর্মচারী। সভাপতি প্রশ্ন করেন আপনি কি হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদক। হরিশচন্দ্র জানালেন দায়ী সম্পাদক বলতে যা বোঝায় আমি তা নই, তবে যিনি কাগজের মালিক আমাকে বিশ্বাস করেন, আমার মতামত সাদরে গ্রহণ করেন, আমি কাগজ চালানোর ব্যাপারে নানা উপদেশ দিই।

সভাপতি প্রশ্ন করেন, আপনি নীল হাঙ্গামার বিষয় ভালভাবে লক্ষ্য করতে পেরেছেন কি? হরিশচন্দ্র জানালেন আমি নীল হাঙ্গামা ভালভাবে পর্যালোচনা করেছি। সভাপতি জিজ্ঞেস করেন, আপনার কাছে কেউ পরামর্শ নিতে এসেছিলেন কি? হরিশচন্দ্র জানান, নীল চাষীরা আমার কাছে এসেছে,উপদেশ নিয়েছে, আমি তাদের দরখাস্ত লিখে দিয়েছি, আমি তাদের দেওয়ানী আদালতে মামলা করতে পরামর্শ দিই।

সভাপতির প্রশ্নের জবাবে হরিশচন্দ্র জানান, আমি হুগলী, বারাসতে গিয়েছিলাম। নদীয়া, রাজসাহী, ময়মনসিংহের গরীব চাষীরা আমার কাছে এসে তাদের দুর্দশার কথা জানিয়ে গেছে। ফার্গুসন প্রশ্ন করেন, আপনি কি এমন কোন কাজ করেছিলেন যার ফলে চাষীরা উত্তেজিত হয়! হরিশচন্দ্র জানান, কোনদিন তিনি সে চেষ্টা করেন নি।

রেভারেন্ড সেল প্রশ্ন করেন নীল চাষীদের উপর কেমন অত্যাচার হত তা তিনি জেনেছিলেন কি? হরিশচন্দ্র জবাবে বলেন, নীল চাষীদের ধরে এনে নীল কুঠির ছোট অন্ধকার ঘরে আটকে রাখা হত, তাদের বিষয় সম্পত্তি লুঠ করা হত, মেয়েদের অপমান করা হত।

চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়ের প্রশ্নের জবাবে হরিশচন্দ্র বলেন, কমিশনের সামনে লারমুর সাহেব মিথ্যা জবানবন্দী দিয়ে গেছেন।

হরিশচন্দ্র ছিলেন মানব কল্যানের শ্রেষ্ঠ পূজারী। তিনি নীল চাষীদের চরম বিপদের সময় তাঁদের পাশে গিয়ে দাঁড়ান। তাদের নানান উপদেশ দিয়েছেন। আর্থিক সাহায্য দিয়েছেন। হরিশচন্দ্র নিজের বাড়িতে অনেক নীল চাষীকে আশ্রয় দেন। তিনি বহু টাকা এভাবে খরচ করে নিঃস্ব হয়ে যান। গ্রামে গ্রামে গেছেন, নীল চাষীদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন তিনি।

হরিশচন্দ্র যখন হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকার পাতায় দিনের পর দিন নীলকর সাহেবদের গরীব চাষীদের উপর অকথ্য অত্যাচারের কাহিনী প্রকাশ করতে থাকেন তখন নীলকর সাহেবরা তাঁকে মেরে ফেলার ভয় দেখায়। কিন্তু তিনি পিছিয়ে যান নি। তিনি নির্ভয়ে তাঁর কাগজে সঠিক তথ্য পরিবেশন করে গেছেন। নীলকর সাহেবরা হরিশের বিরুদ্ধে মামলা করেন। হরিশচন্দ্রকে মামলা চালানর জন্য অনেক টাকা ধার করতে হয়।

হরিশচন্দ্র ছিলেন সুলেখক। তিনি নির্ভীক সাংবাদিক। লর্ড ডালহৌসী তাঁর বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা দেখে চমকে যান। লর্ড ক্যানিং তাঁর ভক্ত ছিলেন। হরিশচন্দ্র ছিলেন মানুষের মত মানুষ। হরিশচন্দ্রের চালচলন ছিল অতি সাধারণ। তিনি সাধারণ পোশাক পরতেন। বিলাসিতা ছিল তাঁর চরম অপছন্দ। তিনি ছিলেন মাতৃভক্ত সন্তান।

হরিশচন্দ্র ইন্ডিগো কমিশনের সামনে শেষ কথা বলেছিলেন, 'আমি এই নীল হাঙ্গামার বিষয় বিশেষ যত্ন ও সাবধানে পর্যালোচনা করিয়াছি। এবং ইহা আমার নিঃসন্দেহে বিশ্বাস যে বর্তমান নীলচাষ প্রজার অহিতকারী, এবং আমি এই মত সময়ে সময়ে প্রকাশ করিয়াছি। ভবিষ্যতে নীলকর ও প্রজার মধ্যে কিরূপ সম্পর্ক স্থাপন হইবে এই বিষয়ে কেবল এক মাত্র সন্দেহ আছে।' □

বাংলা বনাম হিন্দি ছবি

তপন রায়

আজ থেকে প্রায় বছর তিনেক আগে কলকাতা দূরদর্শন কেন্দ্রে দিল্লি থেকে একটি নির্দেশ আসে, যাতে বলা হয়, আপনারা প্রযোজক-পরিবেশকদের অনুরোধ জানান, তাদের নতুন ছবির গান টাকা খরচ করে 'চিত্রমালায় দেখানোর জন্য। মোটামুটি ভাবে একটি রেটও ঠিক করে দেওয়া হয়। রেটটি ছিল গান পিছু পাঁচ হাজার টাকা।

তৎক্ষণাৎ ঐ অনুরোধ জানিয়ে বিভিন্ন পরিবেশকদের কাছে চিঠি যায় কলকাতা দূরদর্শণের অধিকর্তার পক্ষ থেকে। দু:খের বিষয় সেই কাতর আবেদনে কোন পরিবেশকই সাড়া দেন নি। এ জাতীয় অনুরোধ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের আরো অনেক প্রযোজক-পরিবেশকদের কাছেও পাঠানো হয়েছিল, একমাত্র হিন্দিওয়ালারা ছাড়া আর কেউই এতে কোন কর্ণপাত করেন নি। ফলে এখন দিল্লি থেকে প্রচারিত হিন্দি ছবির গানের অনুষ্ঠান 'চিত্রহার'-এ নতুন হিন্দি ছবির গান শোনা যায়। প্রযোজকেরা এর জন্য মোটা অঙ্কের টাকা কর্তৃপক্ষকে দিয়ে থাকেন।

এসব ঘটনা বছর তিনেক আগের। তখন দূরদর্শণে বিজ্ঞাপন সবে একটু একটু করে জায়গা পাচ্ছে। আঞ্চলিক ছবি গুলোর কাছ থেকে সাড়া না পাওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষও আর বিষয়টা নিয়ে মাথা ঘামালেন না। তাঁরা ন্যাশানাল নেটওয়ার্ক চালু করার কাজ নিয়েই বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

বছর ঘুরতে না ঘুরতেই বিজ্ঞাপন প্রায় সব অনুষ্ঠানগুলিকেই গ্রাস করে ফেললো। বিজ্ঞাপন ছাড়া কোন অনুষ্ঠানই আর রইলো না। স্বাভাবিকভাবেই জনপ্রিয় 'চিত্রমালা' ও ঐ দলে নাম লেখালো। এর অর্থ দূরদর্শণের কোষাগার ভর্তি হওয়া। অর্থাৎ কিনা যে টাকার জন্য কর্তৃপক্ষ পরিবেশকদের কাছে চিঠি লিখেছিলেন সেই টাকা তাঁরা অন্যভাবে পেয়ে গেলেন।

ঐ অর্থ যখন পাওয়া গেল, তখন নতুন গান শুনিয়ে শ্রোতাদের আনন্দদানের কাজে বাধা কোথায় রইলো? একথা তো ঠিক নতুন গান দেখানোর জন্য অনুষ্ঠানের মান অনেকখানি বেড়ে যায়। কিন্তু আমি-আপনি যত সহজে ব্যাপারটা ভাবতে পারলাম, দিল্লিওয়ালারা তত সহজে ভাবলেন না। তাঁরা আবার মাস ছয়েক আগে সব কেন্দ্রে নির্দেশ পাঠালেন, ছবি মুক্তির এক বছরের মধ্যে কোন গান বাজানো চলবে না।

ঐ নির্দেশ আসার পরও কিছুদিন নতুন ছবির গান দেখানো হয়েছিল, কিন্তু জানুয়ারি মাস থেকে তা একদমই বন্ধ হয়ে গেছে। শুধু বাংলা নয় হিন্দি ছবির সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতায় আবার হেরে গেল সমস্ত আঞ্চলিক ভাষার ছবিগুলো। হিন্দি ভাষা প্রচারের কাজেই ঐ পরাজয় নিশ্চয় অনেকটা কাজ করবে। 'চিত্রহার' দর্শকদের কাছে যত বেশি প্রিয় হবে 'চিত্রমালা' কখনই তা হতে পারবে না। পুরনো গান দিয়ে আর যাই হোক না কেন, সবশ্রেণীর দর্শকদের মনোরঞ্জন করা সম্ভবপর নয়। সামান্য কিছু টাকার জন্য বঞ্চিত হচ্ছে আঞ্চলিক চলচ্চিত্র, বঞ্চিত হচ্ছে 'চিত্রমালা' কে ভালবেসে ফেলা অগণিত দর্শক। তারা পঞ্চাশ টাকা করে প্রতিবছর ট্যাক্স দিয়ে যাবে অথচ তাঁদের কথাই যতদূর সম্ভব কম ভাবা হবে। কি চমৎকার ব্যবস্থা?

> **দূরদর্শণে বিজ্ঞাপন চালু হয় ১৯৭৬ সালে। ১৯৭৬-৭৭ সালে বিজ্ঞাপনবাবদ ৮০ লক্ষ টাকা পাওয়া গিয়েছিল। ১৯৮০-৮১ সালে ঐ অর্থ বেড়ে হয় ৬ কোটি টাকা। ১৯৮৩-৮৪ সালে ২০ কোটি। চলতি বছরের মার্চ পর্যন্ত দূরদর্শণ রোজগার করছে ৩৫ কোটি টাকা।**

যে টাকার জন্য এই পরিবর্তন, প্রকৃতপক্ষে দূরদর্শনের কিন্তু কোন অর্থাভাবই নেই। তাদের অর্থভান্ডার দিনকে দিন সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর হচ্ছে বিজ্ঞাপনদাতাদের কল্যাণে। তালিকাটির দিকে চোখ রাখলেই একথার সত্যতা প্রমাণিত হবে।

দূরদর্শণে বিজ্ঞাপন চালু হয় ১৯৭৬ সালে। ১৯৭৬-৭৭ সালে বিজ্ঞাপনবাবদ ৮০ লক্ষ টাকা পাওয়া গিয়েছিল। ১৯৮০-৮১ সালে ঐ অর্থ বেড়ে হয় ৬ কোটি টাকা। ১৯৮৩-৮৪ সালে ২০ কোটি। চলতি বছরের মার্চ পর্যন্ত দূরদর্শণ রোজগার করছে ৩৫ কোটি টাকা।

আর আগামী বছর ঐ টাকা কম করেও ৭৫ শতাংশ বেড়ে যাবে, কেননা ইতিমধ্যেই দ্বিতীয় চ্যানেল ছড়িয়ে যাবে অনেক কেন্দ্রেই। রোজগারের অংক ক্রমশ স্ফীত থেকে স্ফীততর হচ্ছে কিন্তু কর্তৃপক্ষের তাতে মন ভরছে না। তাঁরা চাইছেন যে কোন প্রকারেই হোক না কেন ঐ অংক আরো বাড়িয়ে তুলতে। প্রয়োজনে যুক্তি বা বুদ্ধি বিসর্জন দিতেও ওরা পিছুপা নন।

সবাই জানেন, কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত আরেকটি প্রচার সংস্থার নাম 'আকাশবাণী'। সেখানেও বাংলা ছবির গান শোনানোর জন্য 'ছায়াছবির গান' নামে একটি অনুষ্ঠান প্রতি সপ্তাহেই প্রচারিত হয়ে থাকে। মজার ব্যাপার হলো সেখানে কিন্তু নতুন গান শোনানোর ক্ষেত্রে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। দূরদর্শনে নতুন গান শোনানো যদি সেই ছবির পাবলিসিটি হয়ে যায়, ঐ একই গান বেতারে বাজালে কি তা হয় না? তাহলে কি আমরা ধরে নিতে পারি, বেতারের প্রচারকে কর্তৃপক্ষ কোন প্রচার বলে মনে করেন না? আর তাই যদি হবে তাহলে বিবিধ ভারতী'র 'বিজ্ঞাপন কার্যক্রম' চালু রেখে কি তাঁরা বিজ্ঞাপনদাতাদের

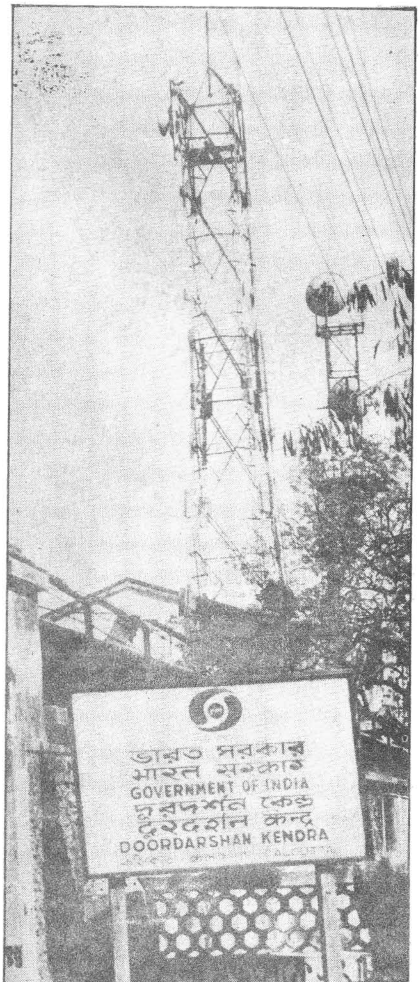

ঠকাচ্ছেন না? অনেক জিজ্ঞাসার মত এসব জিজ্ঞাসারও কোন উত্তর আপনি খুঁজে পাবেন না।

আরো দেখুন, সবাই জানে যে, হিন্দি ছবি চলে থাকে সারা ভারত জুড়ে। শুধু ভারতই নয়, ভারতবর্ষের বাইরেও তার বিরাট বাজার রয়েছে। কোন আঞ্চলিক ছবির সঙ্গে তার তুলনাই হয় না। 'চিত্রহার'-এ গানের বিজ্ঞাপন দিয়ে তারা লাভবানই হয় থাকে। ছবি তৈরি ও পাবলিসিটির বাজেট এত বেশি হয় যে পঞ্চাশ হাজার কি এক লক্ষ টাকা খরচ কম বেশিতে হিন্দি ছবির প্রযোজকদের কিছু যায় আসে না।

অপরদিকে আঞ্চলিক ছবির বাজেট এতই সীমাবদ্ধ হয় যে, হাজার টাকার খরচ বৃদ্ধিও তাদের চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সব আঞ্চলিক ছবির পক্ষে একথা পুরোপুরি প্রযোজ্য না হলেও বাংলা ছবির ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রযোজ্য। এই যখন অবস্থা সেখানে কোন প্রযোজক চাইবেন, ছবির খরচ বাড়াতে?

এর উপর আছে পশ্চিমবঙ্গের লোডশেডিং সমস্যা। সন্ধ্যার পর বহু অঞ্চলই অন্ধকারে ডুবে থাকে। তার জন্য তো বিজ্ঞাপনের খরচ কমবে না। যদি প্রচার সবার কাছে না পৌঁছালো, সেই প্রচারের লাভ কি?

সাধারণত বাংলা ছবির গান হয়ে থাকে সিচুয়েশন নির্ভর। নাটককে জমাট করার কাজেই প্রধানত গান ব্যবহৃত হয়। বাজেট কম বলে কম খরচেই ছবির গান তৈরি হয়। কিন্তু হিন্দি ছবির ব্যাপারটাই আলাদা। তারা একটা গান পিছুই খরচ করে থাকে লক্ষ-লক্ষ টাকা। গান ব্যবহৃত হয় ব্যবসারই কাজে। তাই বেশির ভাগ সময়েই ছবির গল্প তৈরি হবার আগেই গান তৈরি হয়ে যায়। খরচ করে বলে হিন্দি ছবির গান পিকচারাইজেশনও হয় অনেক বেশি দৃষ্টিনন্দন। ঐ দৃষ্টিসুখ কোন আঞ্চলিক ছবিতেই পাওয়া যায় না। তাদের গানের প্রধান অবলম্বন হলো শ্রুতিমধুরতা। শোনাটাই যখন প্রধান, তখন দূরদর্শনের প্রয়োজন হবে কেন?

ঐ সঙ্গে আছে বাংলা গানের সংখ্যার সমস্যা। কলকাতা দূরদর্শনে 'চিত্রমালা' অনুষ্ঠানটি দেখা যায় মাসে দু'বার করে। বিজ্ঞাপনের সময় বাদ দিলে প্রায় চল্লিশ বেয়াল্লিশ মিনিটের ঐ অনুষ্ঠানের দশ থেকে বারোটি গান দেখা যায়। বিজ্ঞাপনের উপর ঐ সংখ্যা কম-বেশিও হয়ে থাকে। দশটি করে গান বাজালে বছরের ছাব্বিশটি অনুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজন দুশো ষাটটি গান প্রতিবছর গড় বাংলা ছবির মুক্তির সংখ্যা হলো ত্রিশ। ছবি পিছু যদি চারটি গানও ধরা হয় তাহ'লে নতুন গান হচ্ছে একশো কুড়ি। মনে রাখতে হবে, ঐগানের মধ্যে বেশ কয়েকটি গানই প্রচার যোগ্য নয়। আলোচনার খাতিরে যদি ধরে নেওয়া গেল সব গানই প্রচার যোগ্য তাহ'লেও প্রায় পুরনো একশো চল্লিশটি গানের প্রয়োজন হয়। এতদিন আধা নতুন আধা পুরনো গান দেখা যাচ্ছিল। অত:পর সবই পুরনো নিয়ে দর্শকদের খুশি হতে হবে। একই গান বারেবার দেখতে হতে পারে, কেননা সব গান তো সবসময় কর্তৃপক্ষর জোগাড় করা সম্ভব হয় না। 'স্টপগ্যাপ' হিসাবে একই গান একাধিক বার ব্যবহৃত হতেই পারে।

আশ্চর্যের ব্যাপার, যে গ্রাহকদের টাকায় দূরদর্শণ সজীব রয়েছে, তাদের পছন্দ-অপছন্দের কথা কর্তৃপক্ষ একবারও ভাবলেন না। ভাবলেন না, মৃতপ্রায় আঞ্চলিক চিত্রজগৎগুলির কথা। 'জাতীয় সংহতি' শব্দটা ইদানীং উঠতে-বসতে ব্যবহৃত হচ্ছে। এরপর যে বঞ্চিত গ্রাহকদের সংহতি অনেক সুদৃঢ় হবে তাতে কোন সন্দেহই নেই। শেষের সেদিন কি ভয়ংকরই না হবে? □

মহার্ঘভাতা দাবীর উৎস সন্ধানে

শঙ্কর ভট্টাচার্য

মহার্ঘভাতা আর এক নাম দুর্মূল্যভাতা বা মাগ্‌গিভাতা। মহার্ঘভাতার সঙ্গে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের মূল্যবৃদ্ধির একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। আসলে জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধির ফলে কোন একটা নির্দিষ্ট সময়ে নির্দ্ধারিত মূল বা প্রকৃত বেতনের যে অবক্ষয় বা ক্ষয়ক্ষতি হয় তা পূরণের নিমিত্ত বেতনভোগী কর্মচারীদের যে ভাতা দেওয়ার রীতি প্রচলিত আছে তাই হল মহার্ঘভাতা।

যতদূর জানা যায়, ভারতবর্ষে মহার্ঘভাতা বা মাগগিভাতা চালু হয়েছিল ১৯৪০ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকে। দানা শস্যের মূল্যবৃদ্ধিজনিত বেতনভোগী কর্মচারীদের মূল বা প্রকৃত বেতনের যে অবক্ষয় বা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল তা পূরণের নিমিত্ত কেন্দ্রীয় নিম্নবেতনভোগী কর্মচারীদের জন্য ১৯৪০ সালে প্রথম "গ্রেন কম্পেন্সেশন্ অ্যালাওয়েন্স" চালু করা হয়, প্রথমে দানা শস্যের মূল্যবৃদ্ধির উপর ভিত্তি করে এই ভাতা দেওয়ার পদ্ধতি চালু করা হলেও ১৯৪২ সালে আরও কিছু কিছু নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধিও কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় আনা হয় এবং যুদ্ধজনিত পরিস্থিতিতে উচু-নীচু সকল প্রকার কর্মচারীর মূল বা প্রকৃত বেতন নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহের মূল্য বৃদ্ধির জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় "যুদ্ধভাতা" নামে মহার্ঘভাতা সকলস্তরের কর্মচারীদের দেওয়া হয়।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের সময় দেশব্যাপী ক্রমাগত নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির ফলে বেতনভোগী কর্মচারীদের মূল বেতনের যে অবক্ষয় হয় তার পূরনের নিমিত্ত মহার্ঘভাতা দেওয়ার প্রয়োজন অনুভূত হয়। তদানীন্তন অবিভক্ত বঙ্গসরকার ১৯৪৪-৪৫ সালে Bengal Administration Enquiry Committee (যা রোল্যান্ড্‌স্ কমিটি নামে খ্যাত) গঠন করেন। উক্ত কমিটি তাঁদের প্রতিবেদনের ৩১৯নং অনুচ্ছেদে বলেন "Pay should be based on long term trends and should not be varied at frequent intervals to meet fluctuations in the cost of living. Wide fluctuation may be meet by cuts or allowance but we regard it as undesirable and unsound to vary basic pay on short term consideration" সম্ভবতঃ রোল্যান্ডস কমিটির উপরোক্ত সুপারিশের উপরই ভিত্তি করে সরকার তার কর্মচারীদের মূল বেতন হার ঘন ঘন পরিবর্তন না করে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধিজনিত মূলবেতনের অবক্ষয় পূরণের নিমিত্ত মহার্ঘভাতা দেওয়ার প্রথা চালু করেন। তখন থেকে মহার্ঘভাতা এবং বাজারের থেকে কমদামে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ বা তার পরিবর্তে নগদ ভাতা (cash allowance) কর্মচারীদের মূল বেতনের সঙ্গে দেওয়া হতে থাকে।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে এবং ১৯৭২ সালে শ্রী সিদ্ধার্থ রায়ের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রী পরিষদ গঠিত হওয়া পর্যন্ত মোট তিন বার যথা ১৯৫০, ১৯৬১ ও ১৯৭০ সাল প: ব: রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের বেতন হার পূনর্বিন্যাস করা হলেও অন্তর্বর্তীকালীন নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিজনিত মূলবেতনের অবক্ষয় পূরনের নিমিত্ত ক্ষতিগ্রস্ত রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা স্বরূপ ক্ষতিপূরণ ভাতা দেওয়ার কোন সুষ্ঠুনীতি চালু করা হয়নি। সরকারের খেয়াল খুশি মত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা দেওয়া হতো, তার সঙ্গে নিত্য

প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি জনিত মূল বেতনের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণের কোন সংগতি থাকতো না। ১৯৫৬ সালে উচু–নীচু সকলস্তরের কর্মচারীদের জন্য সমহারে মাসিক ২৫ টাকা মহার্ঘভাতা প্রদানের দাবীতে কর্মচারীদের রাজ্য কো–অর্ডিনেশন কমিটি এক আন্দোলন গড়ে তোলেন। ১৯৫৭ সালে উক্ত রাজ্য কো–অর্ডিনেশন কমিটির ৫৮ দফার এক দাবি সনদে বলা হয়েছিল যে "মূল্য সূচক বৃদ্ধির সঙ্গে সংগতি রেখে মহার্ঘভাতার বিজ্ঞান সম্মত স্বয়ংক্রিয় ফর্মূলা প্রবর্তনের" কথা। ১৯৬৭ সালে কেন্দ্রীয় সরকার গঠিত ডি. এ. কমিশন (গজেন্দ্র গড়কর কমিশন) এর কাছে সাক্ষ্যদানের সময়ও রাজ্য কো–অর্ডিনেশনে কমিটির দাবী ছিল মহার্ঘভাতার বিজ্ঞান সম্মত স্বয়ংক্রিয় ফর্মূলা। তদানীন্তন যুক্তফ্রন্ট সরকার কর্তৃক কে. কে. হাজরার নেতৃত্বে গঠিত প: ব: রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের জন্য গঠিত প্রথম বেতন কমিশন কর্তৃক ১৯৬৯ সালে প্রদত্ত রায়ে কে. জি. বসু সহ সংখ্যা গরিষ্ঠের সুপারিশ ছিল কেন্দ্রীয় হারে নয়, রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের জন্য উন্নত মানের বিজ্ঞান সম্মত মহার্ঘভাতার সূত্র প্রবর্তন করা।

কিন্তু তদানীন্তন যুক্তফ্রন্ট পরিচালিত রাজ্য সরকার উক্ত কমিশনের কোনো সুপারিশ গ্রহণ বা কার্য্যকর করেন নাই।

ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের জন্য গঠিত তৃতীয় বেতন কমিশন তাঁদের সুপারিশসমূহ কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট পেশ করেন এবং ১৯৭৩ সালে কেন্দ্রীয় সরকার উক্ত সুপারিশসমূহ কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে গ্রহণ ও কার্যকর করেন। কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে উক্ত কমিশনের সুপারিশ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত ছিল যে ১৯৬০ সালকে ভিত্তি বর্ষ (১৯৬০=১০০) ধরে প্রতি ৮ পয়েন্ট নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যসূচক (C.P.I.) বৃদ্ধির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীরা উক্ত ৮ পয়েন্ট মূল্য বৃদ্ধির দিন থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে এক অতিরিক্ত মহার্ঘভাতা কিস্তি পাবেন যা মাসিক ৩০০ টাকা পর্যন্ত মূল বেতনের কর্মচারীরা পাবেন মূল বেতনের শতকরা ৪ ভাগ হারে এবং তদূর্ধ বেতনের কর্মচারীরা মূল বেতনের শতকরা ৩ ভাগ হারে। এর ফলে প্রতি কিস্তি অতিরিক্ত মহার্ঘভাতা প্রদানের সরকারী আদেশ নামা যে দিনই ঘোষণা করা হোক না কেন, কর্মচারীরা প্রতি কিস্তি অতিরিক্ত মহার্ঘভাতা পাবেন যে দিন থেকে মূল্য সূচকের ৮ পয়েন্ট বৃদ্ধি ঘটেছে।

১৯৭৩ সালে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের জন্য উপরোক্ত মহার্ঘভাতাপ্রদানের স্বয়ংক্রিয় সূত্র প্রবর্তনের ফলে রাজ্য কো–অর্ডিনেশন কমিটি দাবী করলেন "মূল্যসূচক বৃদ্ধির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ মহার্ঘভাতার বিজ্ঞানসম্মত স্বয়ংক্রিয় সূত্র প্রবর্তন সাপেক্ষে কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা" পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যসরকারী কর্মচারীদের জন্য। কিন্তু রাজ্যসরকারী কর্মচারী ফেডারেশন, পশ্চিমবঙ্গ –এর দাবি ছিল "কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রবর্তন এবং সেই সূত্র অনুযায়ী অতিরিক্ত মহার্ঘভাতা প্রদান।"

৩১/১২/৭৩ পর্যন্ত প: ব: রাজ্যসরকারী কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা দেওয়া হতো নিম্নলিখিত হারে:

২২৯ টাকা পর্যন্ত মূল বেতনের কর্মচারীদের মাসিক ৭ টাকা হারে, ২৩০–৩৫০ টাকা পর্যন্ত মূল বেতনের কর্মচারীদের মাসিক ৮ টাকা হারে, ৩৫১–৬৫০ টাকা পর্যন্ত মূল বেতনের কর্মচারীদের মাসিক ১০ টাকা হারে, ৬৫১–১৪৭৫ টাকা পর্যন্ত মূল বেতনের কর্মচারীদের মাসিক ১৫ টাকা হারে, ১৪৭৫ টাকার উর্দ্ধে মূল বেতনের কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রান্তিক সামঞ্জস্য-করণ।

১/১/৭৪ তারিখ থেকে ১৪৭৫ টাকার উর্দ্ধে মূলবেতনের কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রান্তিক সামঞ্জস্যকরণ সাপেক্ষে ১৪৭৫ টাকা পর্যন্ত মাসিক মূলবেতনের কর্মচারীদের জন্য সমহারে মাসিক ১৬ টাকা মহার্ঘভাতা বৃদ্ধি করা হয়। এরপর ১/৪/৭৪ তারিখ থেকে সকল শ্রেণীর কর্মচারীদের জন্য সমহারে মাসিক আরও ৮ টাকা অতিরিক্ত মহার্ঘভাতা দেওয়া হয়। এই মহার্ঘভাতা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত ঘোষণায় সিদ্ধার্থ রায় সরকার কর্মচারীদের ৪ টাকা নগদে এবং ৪ টাকা প্রভিডেন্ড ফান্ডে জমা রাখার কথা বলেন। সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মহাকরণের রাজ্য সরকারী ফেডারেশন তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলেন, প্রতিবাদে তাঁরা তদানীন্তন অর্থবিভাগের যুগ্ম–সচিব এন. কে. পালের ঘরের দরজা–জানালার সার্সি ভেঙ্গে দেন। ফেডারেশনের তীব্র বিক্ষোভের ফলে সরকার তার পূর্ব সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে সবটাই নগদে দিতে বাধ্য হন। ১/৪/৭৫ তারিখ থেকে রাজ্য সরকার তাঁদের কর্মচারীদের জন্য আরও অতিরিক্ত ১৬ টাকা মহার্ঘভাতা প্রদান করেন এবং এরপূর্বে প্রদত্ত মোট ৩১ টাকা থেকে ৩৯ টাকা পর্যন্ত মহার্ঘভাতাকে মহার্ঘবেতনে রূপান্তরিত করেন যাতে সরকারী কর্মচারীরা উক্ত মহার্ঘবেতনের উপর বাড়ীভাড়া ভাতা, অবসরকালীন ভাতা, প্রভৃতির সুযোগ পান। এরপর ১/৪/৭৬ তারিখ থেকে সমহারে আরও অতিরিক্ত মাসিক ১৬ টাকা এবং ১/৩/৭৭ তারিখ থেকে অতিরিক্ত মাসিক ২৪ টাকা হারে রাজ্যসরকারী কর্মচারীদের জন্য সিদ্ধার্থ রায় সরকার মহার্ঘভাতা ঘোষণা করেন। ফলে, উপরোক্ত মহার্ঘবেতন ছাড়া প্রত্যেক কর্মচারীর মাসিক প্রাপ্য মহার্ঘভাতা দাঁড়ায় ৫৬ টাকায়।

উঁচু–নীচু সকল শ্রেণীর সকল কর্মচারীকে সমহারে মহার্ঘভাতা প্রদানের নীতি একমাত্র সিদ্ধার্থ রায় সরকারই গ্রহণ করেন, যার ফলে সেই সময়ে একজন রাজ্য সরকারী চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী একজন কেন্দ্রীয় সরকারী চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী থেকে সামান্য কিছু বেশী মহার্ঘভাতা পেতেন।

পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতাসীন বামফ্রন্ট সরকার অর্থ বিভাগের ১৬/১১/৭৭ তারিখের ৯৭১৬–এফ নং আদেশ নামায় রাজ্যসরকারী কর্মচারী ও শিক্ষকদের জন্য দ্বিতীয় বেতন কমিশন গঠন করেন। উক্ত কমিশনের বিচার্য বিষয়গুলির মধ্যে একটি ছিল রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের জন্য মহার্ঘভাতা প্রদানের নীতি সুপারিশ করা দ্বিতীয় বেতন কমিশন গঠিত হওয়ার পর কমিশনের অন্তবর্তী সুপারিশ অনুযায়ী রাজ্য সরকার তাঁদের কর্মচারীদের জন্য যথাক্রমে ১/৪/৭৮, ১/১১/৭৯ ও ১/৯/৮০ তারিখ হইতে কেন্দ্রীয় হারে মোট তিন কিস্তি মহার্ঘভাতা প্রদান করেন। উক্ত দ্বিতীয় বেতন কমিশন তাঁদের প্রতিবেদন ১৫/১০/৮০ তারিখে সরকারের নিকট পেশ করেন।

উক্ত প্রতিবেদনের ৫১ নং পৃষ্ঠায় মহার্ঘভাতা সম্বন্ধে দ্বিতীয় বেতন কমিশনের সুপারিশ সন্নিবেশিত আছে। উক্ত পৃষ্ঠায় কমিশনের সুপারিশের প্রথম স্তবকেই দেখা যায় যে যেরূপভাবে ১৯৬৭ সালে গঠিত কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের জন্য গঠিত তৃতীয় বেতন কমিশন ১৯৬০ সালকে ভিত্তি বর্ষ (১৯৬০=১০০) ধরে ২০০ পয়েন্ট ভোগ্যপণ্য মূল্য সূচকের সাথে সম্পর্ক রেখে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের বেতন হার ১৯৭৩ সালে সুপারিশ করেছিলেন রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের জন্য গঠিত দ্বিতীয় বেতন কমিশনও ১৯৮০ সালে দাঁড়িয়ে অনুরূপ মূল্য সূচকের সাথে সম্পর্ক রেখে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের বেতন হার সুপারিশ করেছেন। যে কমিশন মহার্ঘভাতা না দিয়ে ১/২/৭৭ তারিখ থেকে কর্মচারীদের মাসিক মূল বেতনের শতকরা ১৫ ভাগ হারে বাড়ীভাড়াভাতা দেওয়ার পূর্বতন সরকারের সিদ্ধান্তকে সমালোচনা করতে দ্বিধা করেন নি সেই কমিশন কেন্দ্রীয় তৃতীয় বেতন কমিশন যে মূল্য সূচকের (২০০ পয়েন্ট) সঙ্গে সংগতি রেখে ১৯৭৩ সালে বেতন কাঠামো কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের জন্য সুপারিশ করেছিলেন। সেই ২০০ পয়েন্ট মূল্য সূচকের সাথে সম্পর্ক রেখে ১৯৮০ সালে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের জন্য বেতন কাঠামো সুপারিশ করলেন যখন মূল্যসূচক বৃদ্ধি পেয়ে ৪০০ পয়েন্টের কাছাকাছি, রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের কাছে এর চেয়ে বড় পরিহাস আর কি হতে পারে!

রাজ্যসরকারী কর্মচারীদের জন্য মহার্ঘভাতা প্রদানের রীতি সুপারিশ করতে গিয়ে কমিশন বললেন যে কয়েকটি সংশোধন/উন্নতি সাপেক্ষে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক তাঁদের কর্মচারীদের জন্য মহার্ঘভাতা প্রদানের যে নীতি কার্যকর আছে রাজ্যসরকার কর্তৃক তাঁদের কর্মচারীদের জন্য অনুরূপ মহার্ঘভাতার নীতি কার্যকর করা উচিত। সংশোধন/উন্নতিগুলি হচ্ছে–কেন্দ্রীয় সরকার কিছু সময়ের জন্য মূলবেতনের শতকরা ৪ ভাগ ও ৩ ভাগের পরিবর্তে ৩ ১/২ ভাগ ও ২ ১/২ ভাগ মহার্ঘভাতা তাঁদের কর্মচারীদের দিয়েছেন। যার ফলে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীরা তাদের পাওনা মহার্ঘভাতা থেকে মোট ২ ১/২% কম পেয়েছেন। ঐ ২ ১/২ % ও রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের দেওয়া হোক। এ ভিন্ন মূলবেতনের শতকরা ৪ ভাগ মহার্ঘভাতা প্রদান করা হোক মাসিক ৪০০ টাকা পর্যন্ত মূল বেতনভোগী কর্মচারীদের মূলবেতনের শতকরা ৩ ভাগ মহার্ঘভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে ঊর্ধসীমা মাসিক মূল বেতন ৯০০ টাকার পরিবর্তে ১০০০ টাকা করা হোক এবং কর্মচারীদের ক্ষেত্রে ন্যূনতম মহার্ঘভাতা বৃদ্ধি ৯ টাকা এবং ৪০০ টাকার বেশী মূলবেতনভোগীদের ক্ষেত্রে ন্যূনতম মহার্ঘভাতাবৃদ্ধি ১৬ টাকা করা হোক। অন্য সব ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় নীতি অনুসরণ করা হোক।

২০ এপ্রিল, ১৯৮১ তারিখে দ্বিতীয় বেতন কমিশনের সুপারিশসমূহের উপর সরকারী সিদ্ধান্ত রাজ্য বিধানসভায় ঘোষণাকালে পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে মহার্ঘভাতা সংক্রান্ত দ্বিতীয় বেতন কমিশনের প্রধান সুপারিশ রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই গ্রহণ ও কার্যকর করেছেন, তবে অর্থাভাবের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার তাঁদের কর্মচারীদের বিভিন্ন সময়ে মূলবেতনের মোট শতকরা ২ ১/২ ভাগ থেকে যে বঞ্চিত করেছেন, কমিশনের সুপারিশ মত সে ২ ১/২ ভাগ রাজ্য সরকার তাঁদের কর্মচারীদের এখনই দিয়ে দিতে অপারগ।

কিন্তু রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের মতে অর্থমন্ত্রীর উক্ত ঘোষণা ছিল অসত্য, কেননা বেতন কমিশনের প্রধান সুপারিশ কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক গৃহীত ও কার্যকর কৃত মহার্ঘভাতার স্বয়ংক্রিয় কৃত মহার্ঘভাতার স্বয়ংক্রিয় সূত্র (অর্থাৎ প্রতি ৮ পয়েন্ট মূল্য সূচক বৃদ্ধির দিন হতে এক কিস্তি মহার্ঘভাতা প্রদানের স্বয়ংক্রিয় রীতি) পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে আজও কার্যকরী হয়নি। রাজ্য সরকার মাঝে মধ্যে তাঁদের কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা বৃদ্ধি করেছেন বটে। তবে তা হয়েছে সরকারের মর্জিমাফিক–কোনো স্বয়ংক্রিয় সূত্র অনুযায়ী নয় বা যেদিন যেদিন থেকে প্রতি ৮ পয়েন্ট মূল্য সূচক বৃদ্ধি পেয়েছে বা যেদিন যেদিন থেকে প্রতি কিস্তি মহার্ঘভাতা কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীরা পেয়েছেন সেদিন সেদিন থেকে নয়। প্রতি কিস্তির বেলায় রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের বেশ বৎসরাধিক কাল স্বয়ংক্রিয় হারে বর্দ্ধিত মহার্ঘভাতা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। বর্তমানে তাঁদের পাওনা বকেয়া কিস্তির সংখ্যা কর্মচারীদের মতে ষোল–বার প্রতি কিস্তি পাওনা হয়েছে বহু আগে থেকে।

যে রাজ্য কো–অর্ডিনেশন কমিটি অতীতে দাবী করেছিলেন "মূল্যসূচক বৃদ্ধির সাথে সংগতি রেখে মহার্ঘভাতার বিজ্ঞানসম্মত স্বয়ংক্রিয় ফর্মূলার প্রবর্তন" তাঁরা আর বিজ্ঞান সম্মত স্বয়ংক্রিয় ফর্মূলা প্রবর্তনের কথা মুখে আনছেন না। তাঁরা আজ এসম্বন্ধে নীরব–তাই অধিকাংশ কর্মচারীর মুখে না বললেও রাজ্য–কো–অর্ডিনেশন কমিটির উপর আস্থা হারাচ্ছেন।

রাজ্য সরকারী কর্মচারীফেডারেশনের বিভিন্ন গোষ্ঠীর বক্তব্য যে বিধানসভায় ঘোষিত সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৭৩ সাল থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের মহার্ঘভাতা প্রদানের স্বয়ংক্রিয় সূত্র অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের ন্যায় রাজ্যসরকারী কর্মচারীদের প্রতি ৮ পয়েন্ট মূল্যসূচক বৃদ্ধির দিন থেকে পাওনা প্রতি কিস্তি মহার্ঘভাতা দিতে রাজ্য সরকার আইনানুযায়ী দায়বদ্ধ। সুতরাং তাঁদের দাবী সরকার অনতিবিলম্বে ১৯৭৩ সাল থেকে কার্যকর করে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুরূপ মহার্ঘভাতার স্বয়ংক্রিয় ফর্মূলা রাজ্যসরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে গৃহীত বলে সরকারী আদেশনামা জারী করুন এবং পাওনা বকেয়া মহার্ঘভাতাসহ পাওনা প্রতিটি কিস্তি মহার্ঘভাতা পাওনার দিন থেকে অনতিবিলম্বে কর্মচারীদের দিয়ে দিন। প্রকাশ্যে না বললেও, রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের শতকরা ৯৯ ভাগ রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের উপরোক্ত দাবী সমর্থন করেন যার ফলে রাজ্য কো–অর্ডিনেশন কমিটি কর্মচারীদের ক্রমাগত নৈতিক সমর্থন হারাচ্ছেন। □

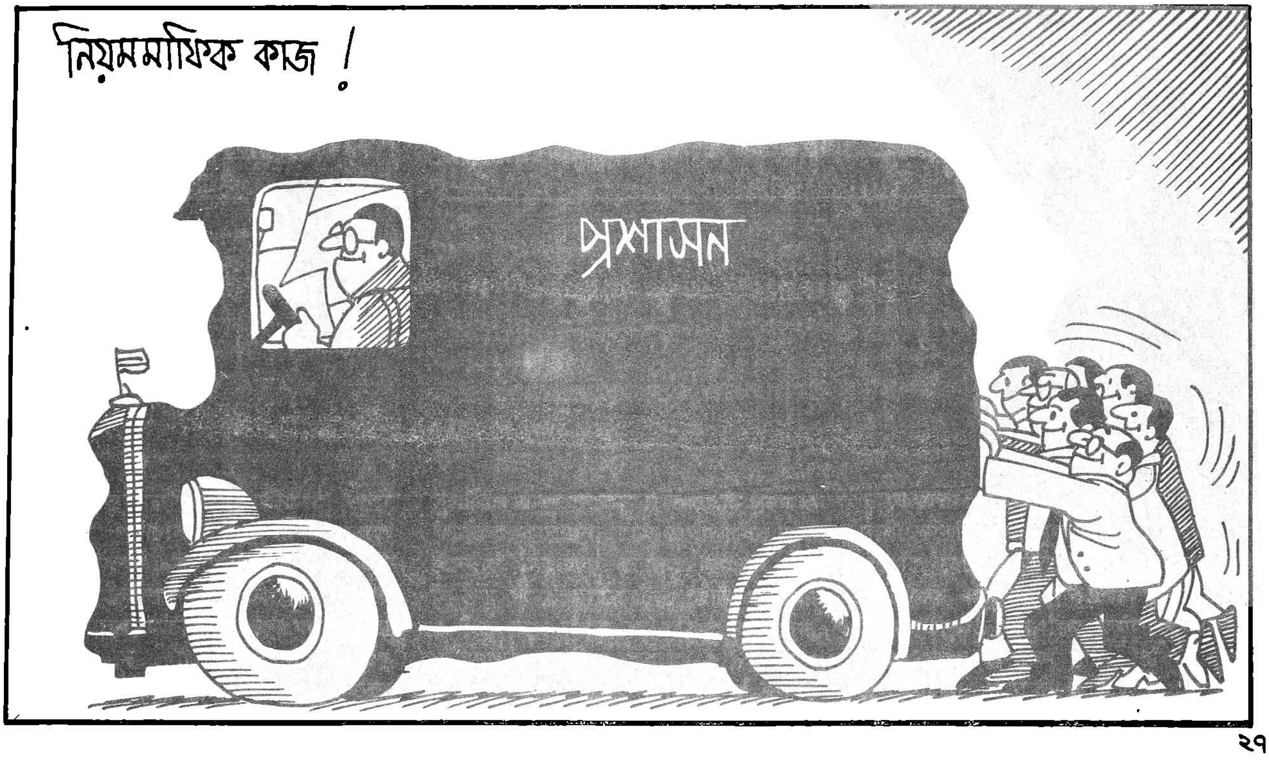

লালবাড়ির রহস্য

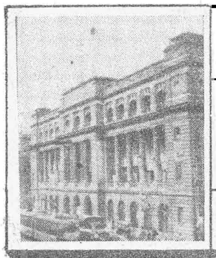

ভি আই পির রক্ষীও ভি আই পি

কমল

কলকাতা পুলিশের সদর ডিসি সুবিমল দাশগুপ্তের দেহরক্ষীও ভি আই পির মর্যাদা পায়। ওঁর দেহরক্ষী খান জেলে ভি আই পির সম্মান পাচ্ছে। ডাকাতি, অপহরণ ও গুন্ডামির দায়ে ধৃত খানের মামলা এখন তুলে নেবার চেষ্টা হচ্ছে। বড় কর্তারা ঘটনাটা ভুলে যাবার চেষ্টা করছেন। কমিশনার বিকাশকলি বসু এই সেদিন লালবাজারে রিপোর্টারদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, লেট আস্ ফরগেট। যা হবার তা হয়ে গেছে। ও নিয়ে আর জল ঘোলা করবেন না।

সদর ডিসি সুবিমলবাবু তো, খান যে এসব কাজকর্ম করতে পারে তা ভাবতেই পারেন না।

আসল কথা দেহরক্ষীর অপকর্ম হালকা করে দেখাবার চেষ্টা হচ্ছে। পুলিশের একজন জাঁদরেল অফিসারকে ভার দেওয়া হয়েছে সব ব্যাপারটা ম্যানেজ করতে। গোমো হাবড়ার যে সব লোক দেহরক্ষীর বিরুদ্ধে নালিশ করেছিল তাদের বোঝানো সোজানো হচ্ছে। মামলা তুলে নিতে বলা হচ্ছে। কিছু লোক রাজি কিছু অবশ্য বড়াই করে পাওনাগন্ডা মিটিয়ে নিতে চায়। হয়তো শেষ পর্যন্ত গ্রামবাসীদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে মামলা তুলে নেওয়া হবে।

সেদিনের ঘটনায় দুটি জিনিস ফাঁস হয়ে গেছে। (এক) পুলিশের গাড়ি অকাজে ব্যবহার হয়। (দুই) চোরাই চালান চক্রের সংগে পুলিশ জড়িত। (তিন) পুলিশ-মস্তানরা জাঁদরেল অফিসারদের নাম ভাঁড়িয়ে মস্তানি করছে।

সেদিন যা ঘটেছে তা হোল: কলকাতা পুলিশের তিন কনেস্টবল মাঝরাতে হাবড়ার সাহারা গ্রামের গোলামকে ভয় দেখিয়ে বার হাজার টাকা আদায় করতে গিয়েছিল। কিন্তু গ্রামবাসীদের তৎপরতায় তারা ধরা পড়ে। পুলিশ তাদের পাকড়াও করে হাবড়া থানায় নিয়ে যায়। ধৃত কনেস্টবলদের কাহন পুলিশের ভাড়াকরা গাড়ির চালক চিত্তরঞ্জন দোলুইও গ্রেপ্তার হয়। হাবড়া থানা পুলিশ এদের কাছ থেকে গুলি ভর্তি রিভলবার আটক করেছে। ডিউটি শেষে এই রিভলবার অস্ত্রাগারে জমা দেওয়া নিয়ম। কিন্তু ওরা তা করে নি।

গাড়িটা পুড়ে ছারখার হয়ে যায় ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীদের হাতে। এরা গোলামের বাড়িতে গিয়ে দেখে সবাই ঘুমোচ্ছে। ওরা সবার ঘুম ভাঙায়। তারপর নিজেদের হাবড়া থানার পুলিশ বলে পরিচয় দেয়। ওয়ারেণ্টের ভয় দেখিয়ে ওরা তাদের থানায় যেতে বলে। গোলাম যেতে অস্বীকার করলেও ওয়ারেণ্টের কথা শুনে ঘাবড়ে যায়। শেষে সে, তার বাবা ও ভাই পুলিশের গাড়িতে ওঠে। কিন্তু থানার বদলে জাতীয় সড়কে কনস্টেবলরা গাড়ি থামিয়ে গোলামের কাছ থেকে বার হাজার টাকা চায়। শেষ পর্যন্ত রফা হয় দুই হাজারে। ওরা গোলামকে ছেড়ে দেয় বাড়ি থেকে টাকাটা আনবার জন্য। সে তখন গ্রামবাসীদের কাছে সব বৃত্তান্ত জানায়। ওদের কেমন যেন সন্দেহ হয়। ওরা কনস্টেবলদের ঘেরাও করে রাখে। অভিযোগ: প্রতিবেশী কালু সেকেন্দরের সংগে গোলামের ঝগড়া। সদর ডিসি সুবিমল দাশগুপ্তের দেহরক্ষী মহম্মদ হাসিম খানের সংগে এই কালু সেকেন্দরের প্রচন্ড ঘনিষ্ঠতা। কালু এই হাসিম খানকে দিয়ে গোলামকে শায়েস্তা করতে চেয়েছিল। পুলিশ থেকে বলা হয়েছে এটা জমিজমা সংক্রান্ত ঝগড়া। আসলে কিন্তু ব্যাপারটা অন্য রকমের। চোরাচালানদারদের ভাগ বাঁটোয়ারা নিয়ে-এই গোলমাল বলে বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেল। সীমান্তের লাগোয়া এই এলাকাটা চোরাচালানদারদের স্বর্গরাজ্য। বাংলাদেশের সীমান্ত থেকে এখানে আসে বিদেশি জামা কাপড়। শার্ট, প্যান্ট, ঘড়ি। লুকিয়ে রাখা হয় হাবড়ার গোপন আস্তাবল। তারপর তা ছড়িয়ে পড়ে কলকাতার ধর্মতলা, গড়িয়াহাট কিংবা ওয়াটগঞ্জে।

হাবড়া থানার সাহারার ঐ দুই প্রতিবেশীর চোরাইচালান চক্রের সংগে আঁতাত রয়েছে। ধৃত দেহরক্ষী ও কলকাতা পুলিশের অন্য দুই কনস্টেবল এই চক্রের চাঁই। টাকার ভাগ নিয়ে গোলমাল। এরা থানা পুলিশের সংগে সবসময় যোগাযোগ রেখে চলে। থানাপুলিশের নেকনজর থেকে এই কনস্টেবলরা চোরচালানদারদের বাঁচায়। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা সদর ডিসি সুবিমল বাবু তাঁর দেহরক্ষীর এই অপকর্মের কথা জানতেন না।

অবশ্য এক শ্রেণীর পুলিশ কনস্টেবলের রাহাজানি, ছিনতাই হুমকি দেখিয়ে টাকা আদায়ের ঘটনা নতুন নয়। এ ব্যাপারে নাম কিনেছে সশস্ত্র পুলিশের কনস্টেবলরা। বিড়লা তারামন্ডলের সামনে, ভিক্টোরিয়ায় কিংবা ময়দানে সশস্ত্র পুলিশের কনস্টেবল ভয় দেখিয়ে যুবক যুবতীদের কাছ থেকে প্রায়ই টাকা আদায় করে। ধরাও পড়েছে কয়েকজন। এদের উৎপাতে ময়দান এলাকায় যুবক যুবতীরা দুদন্ড কথাও বলতে পারে না। ওরা টাকা চায় নইলে বাবা মা'র কাছে ময়দানে প্রেম নিবেদনের ব্যাপারটা ফাঁস করে দেবে বলে হুমকি দেয়।

গত বছরে উত্তর কলকাতার সিঁথি এলাকায় এক ট্রাফিক পুলিশ এক ভদ্রলোকের রঙিন টিভি ছিনতাইয়ের চেষ্টা করেছিল। কিন্ত পথচারীরা তাকে ধরে পুলিশের হাতে দেয়। এক ভদ্রলোক ট্যাক্সি করে বিদেশী রঙিন টিভি নিয়ে যাচ্ছিলেন। ট্রাফিক পুলিশের কনস্টেবল ডিউটি সেরে ব্যারাকে ফিরছিল স্কুটারে চেপে। ভদ্রলোকের টিভির উপর তার নেকনজর পড়ে যায়। বৈধ কাগজপত্র থাকা সত্ত্বেও কনস্টেবল তাঁকে থানায় যেতে বলে। নয়তো টাকা চায়। ভদ্রলোক টাকা দিতে নারাজ হওয়ায় বচসা বাধে। চিৎকার চেঁচামেচিতে লোক জড়ো হয়। ট্রাফিক কনস্টেবলকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

আরো একটা ব্যাপার নিয়ে জোর তদন্ত চলছে। পুলিশের যে গাড়িটা নিয়ে হাবড়ার সাহারায় গিয়েছিল তিন কনস্টেবল সেই গাড়িটায় রাজ্যসরকারের এক উপস্বরাষ্ট্রসচিবকে তাঁর বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে যায়। কিন্ত এটা করার কথা নয়। কারণ সংশ্লিষ্ট উপস্বরাষ্ট্রসচিবের জন্য মহাকরণের গাড়ি নির্দিষ্ট থাকা সত্ত্বেও পুলিশের গাড়ি এই ভাবে ব্যবহার করা বেআইনী। কিন্তু তবুও পুলিশ স্বরাষ্ট্রদপ্তর এবং আদালতের বিচারকদের গাড়ি দেয় অন্যকারণে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের পদস্থ অফিসারদের মন কাড়তে পারলে অদলবদলে সুবিধা হয়। পুলিশের কর্তারা ভাল পোস্টিং আদায় করে নিতে পারেন।□

বাস্তবিক

অরুণোদয় ভট্টাচার্য

নাঃ! অসম্ভব!

বাটার ডজন খানেক শাখা, অমুক ট্যানারি, তমুক সু-হাউস, পনেরটা পাদুকালয় ইতিমধ্যে ঘোরা হয়ে গেছে। কোথাও পেলাম না আমার কাঙ্ক্ষিত বস্তুটি! মনে আসছে রাবীন্দ্রিক দর্শন ঃ যাহা চাই, তাহা ভুল করে চাই! কিন্তু এ যে আমার অনেক দিনের সাধ, প্রাণের প্রগাঢ় সাধনা -- প্লেস্‌কিটের পাম্প্ সু!

চাহিদা শুনে সব কটা জুতোর দোকান চোখ কপালে তুলল! এমন বিস্ময়ে মুহ্যমান ভঙ্গি করল, যেন আমি তাদের কাছে কোন মুদীর দোকানের জিনিস চাইতে এসেছি! তারপর কৃপা করে জানাল, না, মশাই, ওসব আজকাল চলে না! বললাম, মশায়, চলে না কি বলছেন? পায়ে পরে চললেই চলবে! পাম্প্-সু কি আর পুরনো কলকাতার জুড়ি-গাড়ি যে অচল হয়ে যাবে? কিন্তু কে আমার কথা শোনে!

গুনে গুনে চল্লিশটা দোকানে ব্যর্থ চেষ্টার পর পায়ের জোর এবং মনের জোর দুই-ই হারিয়ে ফেলেছিলাম। কিন্তু তবু ভিতরে একটা জিদ মাথা চাড়া দিচ্ছিল। ধৈর্য আর পুরুষকারের পরীক্ষায় রবার্ট ব্রুসকে নিষ্প্রভ করে দেওয়া যায় না? সেই সঙ্গে অবশ্য মগজও খাটাতে হবে।

সমস্যাটা হল, প্রতিটি জুতোর দোকানই তীক্ষ্ণ চোখে নজর রাখতে হবে, কিন্তু সবগুলোয় ঢোকা চলবে না, অনুমান করে নিতে হবে কোথায় প্রার্থিত বস্তু মেলার কিছুমাত্র অসম্ভবনা থাকলেও থাকতে পারে! এ কাজ হনুমানের বিশল্যকরণী সন্ধানের চেয়েও দুরূহতর; কারণ গন্ধমাদনের মধ্যেই জিনিসটা আছে, তাঁর জানা ছিল। কিন্তু আমায় কেউ গ্যারান্টি দেয় যে সারা কলকাতা চষে ফেললে আমি প্লেস্‌কিট্ পাম্প্-সু পাব! 'ভিন্‌টেজ্ কার্'-এর প্রদর্শনী হয়, 'ভিন্‌টেজ সু'-এরও তো হলে পারত!

একটা রিক্সায় গদীয়ান হয়ে ঠুকুর-ঠুকুর করে চললাম। রাস্তার দু-পাশে যত জুতোর দোকান পড়ছে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করছি। পাশ দিয়ে কয়েক সেকেন্ড অন্তর বাস যাচ্ছে, ট্রাম আসছে, পেছন থেকে মিনি বাস হর্ণ দিয়ে পিলে চমকে দিচ্ছে! একবার ডাইনে ঝুঁকে একটা দোকানের সম্ভাবনা যাচাই করছি, হঠাৎ [illegible]

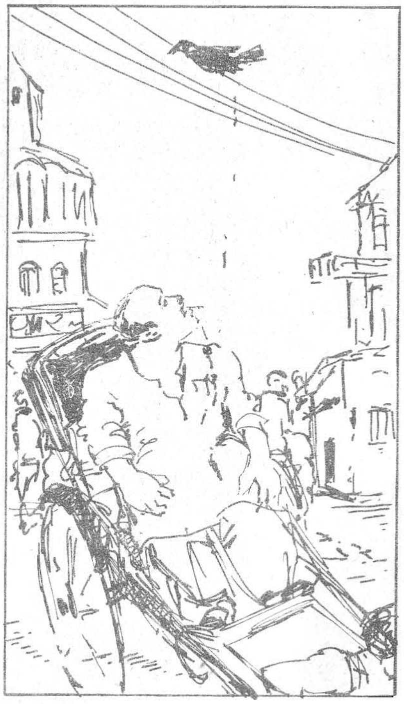

ওপরে ইলেকট্রিকের তারে বসে দোল খেয়ে প্রাতঃকৃত্য সারলেন কোন কাক!

এমনি ভাবে কুড়ি মিনিট চলার পর আমার সিংহ-বিক্রমে বিচলিত ও প্রসন্ন হয়ে ভাগ্যদেবী আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন বেশ বৃহদায়তন একটি দোকানের প্রতি। সাইনবোর্ডে অতি মনোহর অক্ষরে লেখা -- 'চরণ-সেবা হি কেবলম্'!

'রোকো, রোকো, রোকো!'--রাস্তার লোককে সচকিত করে রিক্সা থামালাম দোকানটার সামনে! রিক্সাওলাকে পাঁচ টাকা দিয়ে বিদায় করলাম।

সুন্দর ঠান্ডা, নিরিবিলি দোকানটা। দু দন্ড বসে জিরোবার মত। সেলস্‌ম্যান দুটি স্মিতমুখে অভ্যর্থনা করল যুক্ত করে। বেঞ্চে বসে কি চাই পেশ করার আগেই সাইজ মাপার পা-দানিটা বাড়িয়ে দিল একজন। বললাম, 'মাপ নিয়ে কী হবে? আপনারা কি দিতে পারবেন?'

ওরা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। ক্ষীণ হাসি বিনিময় করল। তারপর নম্র, অর্ধোস্ফুট কণ্ঠে শুধোল, 'কি চাই আপনার?'

'প্লেসকিটের [illegible]!'

[illegible] ফেলল। হয়তো ভাবছিল, আমি ব্রাউজের সন্ধানে এসেছি!

এক মুহূর্ত ভাবল ওদের মধ্যে বয়স্ক লোকটি।

--'পাবেন। তবে এখুনি সাপ্লাই দিতে পারব না!'

আশার আলোকাভাস পেয়ে উল্লসিত হলাম মনে মনে।

বললাম, 'কবে দিতে পারবেন?'

--'আজ ফ্রাইডে। আপনি নেক্স্‌ট ফ্রাইডেতে আসুন। এমনি সময়ে।'

--'আসল প্লেস্‌কিট চাই কিন্তু। এক নম্বর কোয়ালিটি না হলে নেব না আমি।'

-- 'সে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। মান না মেন্‌টেন্ করলে আমাদের নিজেদেরই কি মান থাকবে? এই, নটু, বাবুর জন্যে কোল্ড্ ড্রিংক্স্!'

পরবর্তী জিজ্ঞাস্য আমার--'কত লাগবে বলুন?'

-- 'এ ধরনের জুতোয় লাভ থাকে না। কাস্টমারদের খুশি রাখার জন্যই মাঝে মাঝে আনিয়ে দিই আমরা। আপনার প্রায় কস্ট্ প্রাইসে পাচ্ছেন। আশি টাকা। তবে সবটাই এ্যাডভান্স্ পেমেন্ট্ করতে হবে, বুঝতেই পারছেন... হেঁ হেঁ!'

অরেঞ্জ কোল্ড্-ড্রিংক্স্ কাঠি দিয়ে চুষতে চুষতে মাপ দিলাম। বেশ বাদশাহী মেজাজ।

হঠাৎ তাল কেটে গেল -- নটুর কনুইয়ের ধাক্কায় একটা জুতোর বাক্স আমার মাথায় পড়তেই [illegible] কি ভাগ্যি খালি বাক্স! জুতো সুদ্ধ হলে টাকের ওপর কালসিটে পড়ত নির্ঘাত!

বললাম, 'এখন ফিফ্‌টি পার্সেন্ট, অর্থাৎ চল্লিশ টাকা রাখুন। জুতো হাতে পেলে বাকিটা!'

ওরা একটু ক্যাঁই-কুঁই করে শেষ পর্যন্ত রাজি হল। রসিদ নিয়ে বিজয়গর্বে বেরিয়ে এলাম দোকান থেকে!

* * *

হু-হু করে কেটে গেল মাঝের ছ দিন। আজ আবার শুক্রবার। অফিস থেকে সোৎসাহে ধাবিত হলাম জুতোর দোকানের উদ্দেশ্যে।

নির্দিষ্ট জায়গা বরাবর বাস থেকে নামলাম। ডান ফুটে পা দিতেই, এ কি!

কোথায় সেই সাইনবোর্ড, 'চরণসেবা হি কেবলম্'? তার পরিবর্তে বৃহত্তর হরফে লেখা 'কুবেরালয়', তারপর মাঝারি হরফে 'কলিকাতার বৃহত্তম লটারি-টিকিট বিক্রয় কেন্দ্র', তারপর ছোট সবুজ হরফে– 'অভূতপূর্ব সুযোগ! পুরস্কার অবধারিত...' ইত্যাদি, ইত্যাদি!

সাইনবোর্ডের গায়ে সিঁদুর আমপাতা দিয়ে সাজানো। গাঁক-গাঁক করে মাইক চলছে। অর্থাৎ দোকানটির সম্ভবত আজই শুভ-দ্বারোদ্ঘাটন হয়েছে! ব্যাপারটা প্রচণ্ড অশুভ মনে হল আমার কাছে। কারণ এর অর্থ, 'চরণসেবা' গণেশ উল্টিয়েছে!

প্রাথমিক আঘাতটা একটু সামলে ব্যাপারটা কি হল জানার জন্য ছটফট করছি। অথচ জিজ্ঞাসা করি কাকে? দোকানে ঢুকতে গিয়ে দেখি এলাহি ব্যাপার। সারি সারি গোটাকতক কাঁচ-ঘেরা কাউন্টার। আর রাশি রাশি লোক 'কিউ' দিয়েছে!

গত্যন্তর না দেখে একটা লাইনে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

কাউন্টারের লোকটাকেই জিগ্যেস করতে হবে, যদি কিছু জানে! ঝাড়া আধ ঘন্টা পরে আমার পালা এল।

লোকটিই আমাকে জিগ্যেস করল –– 'কটা চাই?'

আমার গোপালভাঁড়ের কথা মনে হল!

ঘাবড়ে গিয়ে প্রথমটা কথাই বলতে পারলাম না!

লোকটি আবার বলল, 'কোন্ সিরিজ দেব?'

আমি বলতে চাইলাম, পাম্প্-সু দেবার কথা। কিন্তু কথা আটকে গিয়ে মুখ দিয়ে বেরল 'পাম্-পাম্'!

সঙ্গে সঙ্গে লোকটি বলল, 'পানজাব এ কাউন্টার না! এটা কেরালা!'

তখন মরিয়া হয়ে বললাম, 'এটা জুতোর দোকান ছিল না? হঠাৎ হোল্ ইন্ডিয়া হয়ে গেল কী করে?'

শুনে পিছনের লোক খাপ্পা হয়ে হৈ-হৈ করে উঠলঃ 'বেরিয়ে যান, মশাই লাইন থেকে! যত পাগলের কারবার!'

দেখলাম, না বেরিয়ে এলে ওরা আমাকে জুতো-পেটা করেই বার করবে! তাই টলতে টলতে ফুটপাতে নেমে দাঁড়ালুম।

আবার একবার ভেবে দেখলাম, জায়গাটা সম্পূর্ণ ভুল করছি না তো? না, ঐ তো উল্টো ফুটে ইউনাইটেড্ ব্যাঙ্ক। পাশে একটা বুক-স্টল। আর এদিকে লাইট-পোস্টের গায়ে সেদিন বিশেষভাবে লক্ষ্য করা একটা আকর্ষণীয় হিন্দি সিনেমার স-ছবি বিজ্ঞাপন!

চারিধারে আর সবই ঠিক আছে। শুধু আমার পায়ে হাত বুলিয়ে চল্লিশটা টাকা নিয়েছে 'চরণসেবা হি কেবলম্'! □

শনিবারের চিঠি

বিজ্ঞাপনের হার

	স্বাভাবিক হার	চুক্তি অনুসারে হার
এক পাতা	২,০০০/-	১,৮০০/-
আধ পাতা	১,২০০/-	১,০০০/-
১/৪ পাতা	৭৫০/-	৬০০/-
এক কলাম	৭৫০/-	৬০০/-
১/২ কলাম	৪০০/-	৩৫০/-
চতুর্থ মলাট (চার রঙ)	৫,০০০/-	৪,৫০০/-
ভেতরের দ্বিতীয় মলাট (সাদা কালো)	২,৫০০/-	২,২০০/-

রঙীন বিজ্ঞাপনের জন্য ঃ-

ভেতরের পাতায় প্রতিটির জন্য ১০০% অতিরিক্ত। ট্রান্সপারেন্সি গ্রহণ করা হয়। প্রতিটি অতিরিক্ত ট্রান্সপারেন্সির জন্য ৫০০ টাকা বেশি

নিয়মাবলী

গ্রাহকদের জন্য:

- শনিবারের চিঠির চাঁদার হার সডাক বার্ষিক একশো টাকা, ষাণ্মাসিক পঞ্চাশ টাকা, ত্রৈমাসিক পঁচিশ টাকা।
- চাঁদা নগদে, মনি-অর্ডারে, ড্রাফ্‌টে বা কলকাতার ব্যাঙ্কে চেক মারফত দেওয়া চলবে।
- যে কোনও সংখ্যা থেকে গ্রাহক হওয়া যাবে।
- ভি. পি. তে পত্রিকা পাঠানো হয় না।
- অপ্রাপ্ত সংখ্যার জন্য সাক্ষাতে বা চিঠি লিখে জানালে বিবেচনা করা হবে।

এজেন্টদের জন্য:

- কলকাতার বাইরে যে কোনও জায়গায় এজেন্সি দিতে আমরা ইচ্ছুক।
- এজেন্টরা চিঠি লিখলে আমাদের ছাপানো নিয়মাবলী পাঠানো হবে।

আদালতী হক

শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

খুব টাটকা ছানা জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট যে কি ছিল, ইউ. পি-তে তোমাদের ধারণা নেই। জন্টসাব। এ ম্যাজিস্ট্রেট নয় -- এরা জন্ট্। উপরওয়ালাকে সামান্য একটু মানত বড়ো বাপের মত, তা ছাড়া, এই জন্টই হল জঙ্গিলাট, হোয়াইট-হল, গবর্মেন্ট। সেই হেন জন্ট্ নিয়ে চিরটাকাল কাজ চালিয়ে এলুম দাদা, আর আজ কংগ্রেস কংগ্রেস ক'রে আমাদের কাছে চালাকি মারতে এসো না। আমরা পুরোনো ঘোড়ার সওয়ার, অত সহজে পড়ি না। সাদা খদ্দরের গান্ধী টোপি প'রে যে এত তাড়াতাড়ি আমার ধাত বদলিয়ে দেবে, এ হবার নয়। আজকে এজলাসে ঢুকে জন্টের সামনে দাঁড়াতে পেরেছ, কিন্তু আমরা পেশকার যে কি চীজ সে এখনও বুঝতে তোমাদের অনেক দেরি। আমরা দেশী টাট্টু। বাবাজী, এ জগৎটা সোজা নয়। বাইরের শত্রু মারতে পার, ঘরের শত্রু শক্ত মারা। আমাকে পূজো না দিয়ে যে চাতালে উঠে নিজের কাজ হাসিল করবে, তা চলবে না। সিক্কা ছাড়া কাজ হাসিল হয় না। তোমরা ছেলেমানুষ, অল্পেতে রক্ত গরম হয়ে ওঠে; মেজাজ ঠান্ডা ক'রে নরম হয়ে ভেবে দেখ, সোনাতে পান দিতে হয়, রুটিতে খামিরা দিতে হয়, পোলাওয়ে জাফরানটা দিতে হয়।

অত চ'ট না, চোখ লাল ক'র না। ব'স বাবাজি, ব'স। অনেকদিন আগেকার কথা একটা তোমায় বলি। কথাটা তোমার চোখে আতরের মত লেগে থাকবে।

বাপু হে, ঘুষ কখনও বন্ধ হয় না। ওটা আমাদের ন্যায্য পাওনা -- হক। বিশ বছর আগে স্বয়ং এই এজলাসের মালিক হর্তাকর্তা বিধাতা জন্ট সাহেব একদিন ঘুষ বন্ধ করতে গিয়েছিলেন, তোমরা তো কোন্ ছার!

আরে মশাই, সে কি-বিপদ! তার হুকুম অমান্য করে ঘাড়ে কার এমন রক্ত আছে! আচিনস সাহেব এ দেশের পাস-করা জয়েন্ট নয়, সে খাস বিলিতী জয়েন্ট, যার সামনে ডিপ্‌টিরা কাঁপত, কোতোয়াল ঘামত, চাবুকের চোটে কথা শুনত ইন্‌স্পেক্টররা। সেই হেন জাঁদরেল যা পারল না, আজ এসেছ গান্ধী টোপি এঁটে তুমি তাই আমাকে পারাতে! সোজা উপদেশ দিচ্ছি, জেনে রাখ, ঘুষ কখনও বন্ধ হয় না।

সেদিন এজলাসে এসে আচিনস সাহেব টেবিল চাপড়িয়ে হুকুম দিলেন, আমরা যেন পকেটে পয়সা নিয়ে না আসি। থাকলে কৈফিয়ত দিয়ে কাজে বসতে হবে। রিশওয়াৎ বন্ধ্।

রিশওয়াৎ বন্ধ্ তো বন্ধ্। কিন্তু তাতে আমাদের কি? হক তো ছাড়া যায় না। খাব কি? ত্রিশ টাকা মাইনে। কাছারির পেশকার আমি, বাড়িতে হোলি-দেওয়ালি আছে, পাঁচটা রইস আমার এখানে এসে বসে, সাহেবের কানে কথা বলতে হ'লে আমি ছাড়া আর কাকেই বা তারা বলবে, দুঃখু জানাবে! এই শর্ম্মাই তো সাহেবের কান। জলটা-আসটা খাওয়াতে হয়, খাতির তোয়াজ্জো করতে হয়। সে কি আর ত্রিশ টাকায় হয় বাপু! অথচ সাহেবের হুকুম, অমান্য করে কার ঘাড়ে দুটো মাথা! ভাবতে ভাবতে বাড়ি এলুম।

ভেবে কিছু পেলুম না।

তার পরের দিন, যাই হোক পকেটে কিছু রাখলুম না।

যা করবেন ভগবান -- এই মনে ক'রে ফেল্টের দোপাল্লিটা মাথায় এঁটে পুরোনো আচকানটা গায়ে টেনে ঘরের এক্কায় খুটখুট ক'রে গিয়ে কাছারিতে হাজির হলুম। নিজের জায়গাটিতে উঠে ডায়াসের উপর বাক্সটি খুলে নথি নিয়ে বসলুম। চশমার ফাঁক দিয়ে দেখি, আমলাদের মুখ চুন, কূলকিনারা করতে পারে নি। ইস্তক, সাহেবের পেয়ারের খাসবাংলার আরদালী আবদুল গণি, আমাদের শিক্ষাগুরু, তারও দাড়ির মেহেদির রঙে যেন একটু ফ্যাকাশে প'ড়ে গেছে। আচিনস সাহেব এলেন, সওয়ালখানি সুরু

হ'ল। সাহেবের মুখ দেখি আর ভড়কে যাই। কোন্‌টাই বা আগে দি, কোন্‌টাই বা পরে দি! টাকা আর হাতে আসে না। চারদিকে ঘুরছে সাহেবের চোখ, যেন শিকার খুঁজছে একটা বাঘ। কি করি! চল্লিশ-পঞ্চাশখানা সওয়ালখানির উপর হুসহুস ক'রে হুকুম হয়ে গেল। চাঁদির দরিয়া খামাকা বহে যাচ্ছে, অথচ নিতে পারছি না। মনটা মসমস করতে লাগল। হঠাৎ আর থাকতে পারলুম না; দেখি বাঁ হাতটা যেন আমাকে না জানিয়েই চিরকালের অভ্যাসমত একটা টাকা নিয়ে ফেলেছে।

সঙ্গে সঙ্গে গর্জ্জন উঠল, দরওজা বন্ধ্ করো, তল্লাসি হোগা। মোকদ্দমা বন্ধ হয়ে গেল, হুলস্থূল কান্ড, সাহেবের হুকুমে আরদালী দৌড়ল, ইন্‌স্পেক্টর এলেন, সাক্ষী এল, চাপরাসীরা ঘিরে দাঁড়াল; সাহেব ডায়াস থেকে নেমে পেন্টুলুনের পকেটে হাত দিয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে দাঁড়ালেন। শুধু গণি মিঞার মুখে দেখি একটু কেমনধারা ভাব -- আমার যদি পাক্কা সাগরেদ হও তো বেরিয়ে যাবে।

ইশারা পেয়েই আমার শরীরটা ডায়াস থেকে নীচে নেমে এসে দাঁড়াল। দুজন পুলিস আমাকে তন্নতন্ন ক'রে খুঁজলে। আচকান, টুপি, জুতোর ভিতর খুঁজে দেখতে লাগল; টাকাটা কোথায়? মুখে আঙুল দিয়ে হাঁ করিয়ে দেখলে টাকা নেই। দরি উঠাও, দিরাজ খোলো, টেবুলকা কাপড়া ঝাড়ো, বাকস দেখো -- টাকা নেই। ঘরের আনাচে কানাচে খোঁজ হ'ল, নেই টাকা। জানলার বাইরের মাঠে খোঁজ চলল, যদি উড়ে গিয়ে প'ড়ে থাকে। টাকা নেই, পাওয়া গেল না। আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম। গণি মিঞার চোখে -- সাবাস, নাকে দীর্ঘনিশ্বাস, দাড়ির মেহেদি যেন বললে -- ইজ্জৎ রইল।

আচিনস সাহেব পকেট থেকে হাত বের ক'রে এজলাসে উঠে বসলেন। গম্ভীর মুখ, বললেন, দরোয়াজা খোলো, পেশী হোয়।

বাইরের ঝড় থামল, কিন্তু আমার ভিতরে তখন ঝড় বইছে। পেশকারের গদিতে ব'সে এত বড় অপমান কখনও সই নি। কি করি! ডায়াসে উঠে হুজুরের সামনে মোকদ্দমার কাগজ পেশ ক'রে দুখানা ফুলস্ক্যাপ টেনে নিয়ে দরখাস্ত লিখলুম ডিভিসানাল কমিশনারের নামে। কড়া ক'রে দরখাস্ত লিখলুম, জানালুম -- এতদিনকার পুরোনো খয়ের-খাঁ নিমকহালাল তাঁবেদারের অদৃষ্টে কি শেষ পর্যন্ত এই ছিল! হুজুর, আল্লা-তালা মালিক, এর একটা বিচার হোক, বিনা কসুরে এত বড় অপমান হয়ে গেছে। পেশকারের গদিতে ব'সে থাকলে লোকে আর মানবে না।

মোকদ্দমা শেষ হতেই মাথা নীচু ক'রে আচিনস সাহেবের সামনে আমার দরখাস্ত পেশ করলুম, -- যেন তিনি নিজের মন্তব্য দিয়ে উপরওয়ালার কাছে ফরওয়ার্ড ক'রে দেন। দেখলুম, আচিনস সাহেব চোখ না তুলেই কাগজচাপা দিয়ে দরখাস্তখানি চেপে রাখলেন। অন্য মোকদ্দমা সুরু হ'ল।

পেশকারের গদিতে ব'সে আমি মনে মনে বললুম, -- বেশ, কাগজ চাপাই দাও, পাথর চাপাই দাও, দেরাজের মধ্যেই পোর, আর বাক্স বন্ধ ক'রেই নিয়ে যাও, এ বাবা গভর্মেন্টের রাজত্ব, চেপে রাখতে কিছু পারবে না। বের করতেই হবে।

গণির দিকে চেয়ে বুকে বল পেলুম, যেন সে বলছে, ঠিক করেছ খুবলালজী। এখন ঠেলাটি বুঝবে।

চারটে বাজল, এজলাস শেষ হ'ল, আহ্‌মেদ, উকিল, মোক্তাররা গুটি-গুটি বাড়ি গেল। বাইরে চেয়ে দেখি, নিমগাছের নীচে একটু ভিড় জমেছে। বুঝলুম আমারই অপেক্ষায়।

সাহেব আর ওঠেন না। খাড়া দাঁড়িয়ে আছে পিছনে গণি মিঞা, হাতের তেলো তার শুকনো, মনমরা। আমার মনের ভিতরটা একটা আতঙ্কে তমতম করছে। আমি নিয়ে ঘরে এই তিনজন, আর কেউ নেই। সাহেব আর ওঠেন না। দরখাস্তটা কাগজচাপা থেকে বার ক'রে দুচার লাইন প'ড়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখলেন। মর্ম্মটা ঠিক বুঝেছেন। মুখের ভাবটা এমনই যেন এসব তো বুঝলুম, এখন বলতে পার টাকাটি কোথায় রেখেছ? আমা হেন দুঁদে জয়েন্ট সাহেব, তাকেও কাত করতে চাও! ঠোঁটে একটু হাসির রেখা টেনে বললেন, খুবলাল, দরখাস্ত্ তো দেখছি, এসব যা হবার সে তো হবেই। কিন্ত হাতে তোমার টাকা দেখলুম, রাখলে কোথায়? টাকা তো আর কর্পূর নয়।

আমি জোড়হাত ক'রে হুজুরে বললুম, আজ আমার মান ইজ্জৎ সমস্ত গেছে। আমি টাকা নিই নি। আজ নয়, জীবনে কখনও পানপাত্তার জন্যে একটি কানাকড়িও নিই নি। এখন আমারই মত একজন গরিব হুজুরের কুনজরে পড়ল?

সাহেব দোয়াতদান থেকে কলমটা তুলে নিয়ে চেয়ারে পিঠ লাগিয়ে আঙুলের মধ্যে কলমটা দোলাতে দোলাতে আমার চোখে চোখ রেখে হেসে বললেন, এদিকে এস খুবলাল।

আমি এগিয়ে গেলুম, আবার কি নতুন বিপদ! যাক, ঈশ্বর তুমি মালিক।

আচিনস সাহেব অতি ধীরে ধীরে বললেন, ভয় নেই। আমি ইংরেজ, জবান দিলুম -- তোমার অনিষ্ট হবে না।

অভিনয় করছেন কিনা বুঝতে পারলুম না; কিন্ত দেখতে পেলুম, সেই মুহূর্ত্তে যেন চোখের ভিতরকার বাঘটা আর নেই। বললেন, খুবলাল, আমায় বলতেই হবে, টাকাটা কোথায় রেখেছ।

গণি মিঞার দিকে চাইলুম। সাহেব তখনই চমকে উঠলেন, পিছন ফিরে দেখলেন, গণি মিঞা ছবির মত দেয়ালে সেঁটে দাঁড়িয়ে আছে। খ'সে পড়ল গণি মিঞা, যেন ঝড়ের মুখে খড়।

আমি তখন বললুম, হুজুর টাকা আমার কাছে নেই।

বললেন, নেই তো জানি, কিন্তু আছে কোথায়?

হুজুরের কাছে।

চমকে বললেন, আমার কাছে? নিজের পকেট দেখলেন, বুক পকেট, ভিতরকার পকেট, পাৎলুনের পকেট, ঘড়ির পকেট। বললেন, না তো।

বললুম হুজুরের সামনেই আছে।

সামনে? কোথায়?

দোয়াতদান।

আচিনস সাহেব হাতের কলমটা নিয়ে দোয়াতের ভিতর ডুবিয়ে দিলেন, খানিকটা নাড়লেন, তারপর নিবের মুখে কালো টাকাটি টেনে বার ক'রে ঠক ক'রে ফেলে দিলেন। খানিকটা কালি প'ড়ে গেল টেবিলের সবুজ কাপড়ের উপর। তারপর ধীরে ধীরে দরখাস্তখানা তুলে নিয়ে কুচি-কুচি ক'রে ছিঁড়ে ফেলে দিলেন, যেন ছিঁড়ে ফেললেন খুবলালের মন, বেঁচে রইল পেশকার। বললেন, খুবলাল, তুমি জিতলে, তোমার রিশওয়াতের টাকা আমি সুভ্নির করে নিলুম। এর পরে আমার এজলাসে তোমার সাত খুন মাপ।

রিশওয়াৎ যে নিতে হয়, সে কার জন্যে নেওয়া? নিজের জন্যে? এত ছোট জিনিস নিয়ে আমাদের কি হবে, বাপু? উপকারে লাগে না। যাঁদের জন্যে নিই, তাঁরাই জানেন, আবার তাঁরা জেনেও জানেন না। তাঁদের বিবিরা যে চার পয়সায় চব্বিশটা মুরগীর ডিম পান, সে কিসের খাতিরে? শুনেছ কখনও ছ পয়সায় ছটা মুরগী, তিন পয়সা সেরে কাঁসার বাসন মেলে? না বাপু, না কিন্ত ক'র না, ওটা দিতে হয়।

খদ্দরের গান্ধী টোপি প'রে ঘুষ বন্ধ করবে তুমি? যতদিন ঐ সবুজ কাপড়টার উপর কালির দাগ থাকবে, ততদিন আমাকে পূজো না দিয়ে চাতালে উঠতে পাবে না। দাও, ছাড়ো সিক্কা, পরে কাজের কথা ব'ল। □

বছরে দুবার নির্বাচন

শংকর ঘোষ

আমাদের সংবিধান রচয়িতারা যখন লোকসভা ও বিধানসভার মেয়াদ পাঁচ বছর নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন তখন তাঁরা নিশ্চয়ই ধরে নিয়েছিলেন যে স্বাভাবিক অবস্থায় নির্বাচন পাঁচ বছর অন্তর অনুষ্ঠিত হবে। সাধারণ নাগরিক পাঁচ বছরে একবার কেন্দ্রে ও রাজ্যে তাঁর পছন্দমতো সরকারকে নির্বাচন করে নিশ্চিন্ত হবেন এবং প্রশাসনে নির্বাচনজনিত অচলাবস্থা ওই পাঁচ বছরে একবারই সৃষ্ট হবে। তখন তাঁরা নিশ্চয়ই ভাবেননি যে দেশে এমন অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে যাতে বছরে দুটি সাধারণ নির্বাচনেও লোকে বিস্মিত হবে না, তজ্জনিত দীর্ঘ, প্রায় বৎসরব্যাপী প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তায় ক্ষুব্ধ হবে না, তাকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গ বলে মেনে নেবে।

স্বাধীনতার প্রথম দুই দশকে দু'একটি রাজ্যের কথা বাদ দিলে দেশের সর্বত্রই পাঁচ বছরে একবার সাধারণ নির্বাচন হয়েছিল, কিন্তু চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পর থেকে সম্ভবত এমন কোন রাজ্য নেই যেখানে পাঁচ বছরে একাধিক নির্বাচন না হয়েছে। যে পশ্চিম বাংলা বামপন্থী প্রভাব সত্ত্বেও ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত রাজনৈতিক স্থিতির রাজ্য বলে গণ্য হত, সেই পশ্চিম বাংলাতেই ১৯৬৭ থেকে ১৯৭২ পর্যন্ত পাঁচ বছরে চারটি সাধারণ নির্বাচন হয়েছিল—তিনটি বিধানসভার অন্তর্বর্তী নির্বাচন ও একটি লোকসভা ও বিধানসভার একত্রে অন্তর্বর্তী নির্বাচন।

১৯৭২ সালে এ রাজ্যে রাজনৈতিক স্থিতির পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়। সেই স্থিতি এখনও অব্যাহত আছে যদিও ইতিমধ্যে কংগ্রেস ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে ও বামপন্থীরা তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। কিন্তু সেই পাঁচ বছর অন্তর নির্বাচন আর ফিরে আসেনি। ১৯৭৭ সালে পশ্চিম বাংলায় দুবার নির্বাচন হয়েছে—একবার লোকসভার আর একবার বিধান সভার, ১৯৮০ সালে একবার লোকসভার, ১৯৮২ সালে একবার বিধানসভার, ১৯৮৪ সালে একবার লোকসভার। অর্থাৎ ১৯৭৭ সাল থেকে ১৯৮৪ সাল এই সাত বছরে যেখানে সাধারণ নিয়মে দুটি সাধারণ নির্বাচন হওয়ার কথা সেখানে হয়েছে পাঁচটি। এখন যা দাঁড়িয়েছে তাতে কেন্দ্রে ও পশ্চিম বাংলায় রাজ্যস্তরে যদি সুস্থিত সরকার গঠিত হয় তাহলেও এ রাজ্যে পাঁচ বছরে একটির জায়গায় দুটি সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে হবে।

পশ্চিম বাংলার চেয়ে যেসব রাজ্যের রাজনীতি অস্থির সেখানে আরও ঘন ঘন সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। নির্বাচনের সংখ্যা আরও বেড়ে যেত যদি না কেন্দ্রে মোটামুটি একটি সুস্থিত সরকার বরাবর গঠিত হয়ে আসত। এবারের লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের অভূতপূর্ব বিজয়ের কারণ হিসাবে বলা হচ্ছে যে ইন্দিরা গান্ধীর হত্যায় বিচলিত হয়ে জাতীয় সংহতি ও নিরাপত্তা যাতে বিঘ্নিত হয় তার জন্য ভোটাররা বিপুল সংখ্যায় কংগ্রেসকে ভোট দিয়েছেন। এই যুক্তির সত্যাসত্য যাই হোক না কেন, একথা ভুললে চলবে না যে এদেশের ভোটাররা বরাবরই কেন্দ্রে একটি সুস্থিত সরকারের জন্য ভোট দিয়ে এসেছেন। দেশের ঐক্য ও সংহতি রক্ষার জন্য যদি কেন্দ্রে একটি সুস্থিত সরকার অবশ্য প্রয়োজনীয় হয় তাহলে বলতে হবে এপর্যন্ত যতগুলি লোকসভা নির্বাচন হয়েছে সবগুলিতেই ভোটাররা দেশের ঐক্য ও সংহতি নিঃশঙ্ক করবার জন্য ভোট দিয়েছেন। প্রায় সবকটি লোকসভা নির্বাচনেই যে কংগ্রেস জয়ী হয়েছে তার কারণ এদেশে কংগ্রেসই একমাত্র দল যে একক শক্তিতে কেন্দ্রে সরকার গঠনের ক্ষমতা রাখে। কংগ্রেসের বিকল্প হিসাবে একবারই মাত্র একটি দলের আবির্ভাব হয়েছিল, এবং ১৯৭৭ সালে সেই জনতা দলকে ভোটাররা নির্বাচনে জয়ী করেছিলেন। জনতা সাধারণ মানুষের সেই আস্থা রাখতে পারেনি। জনতা খন্ডবিখন্ড হওয়ার পর, বলা যেতে পারে অনন্যোপায় হয়ে ভোটাররা আবার কংগ্রেসকে ক্ষমতায় বসিয়েছেন। লোকসভা নির্বাচনের ক্ষেত্রে জাতীয় নিরাপত্তা ও সংহতির প্রশ্নটি যতদিন ভোটারদের কাছে সবচেয়ে বড় বিচার্য বিষয় থাকবে এবং যতদিন ভোটারদের এ-ধারণা বজায় থাকবে যে বহুদলীয় সরকার সুস্থিত হতে পারে না ততদিন কেন্দ্রে কংগ্রেস ছাড়া অন্য কারও ক্ষমতায় আসা সম্ভব হবে না।

সে যাই হোক, ১৯৭৭ সালে কেন্দ্রে ক্ষমতা হস্তান্তরের পর থেকে দেশে সাধারণ নির্বাচনের সংখ্যা বেড়ে গেছে। ১৯৭১ সালের লোকসভা নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস যেমন জয়ী হয়েছিল তেমনি পরবর্তী কয়েকটি বছরের বিধানসভা নির্বাচনেও কংগ্রেসের জয় হয়। কাজেই ১৯৭৭ সালের লোকসভা নির্বাচনে যখন কংগ্রেস পরাজিত হল তখন দেশের প্রায় সবকটি রাজ্যেই কংগ্রেস সরকার। এই সব কংগ্রেসী রাজ্যগুলির যে কটিতে লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস পর্যুদস্ত হয়েছিল কেন্দ্রের জনতা সরকার স্থির করেন যে সেই সব রাজ্যগুলিতে অবিলম্বে বিধান সভা নির্বাচন করতে হবে। এই অকাল নির্বাচনের সপক্ষে জনতা সরকারের যুক্তি ছিল যে লোকসভা নির্বাচনের ফলে বোঝা গেছে যে এইসব রাজ্যে ভোটাররা তাঁদের পছন্দ পরিবর্তন করেছেন, তাঁরা আর কংগ্রেসী শাসন চান না। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে কেন্দ্রের জনতা সরকার নয়টি রাজ্যের কংগ্রেস সরকারকে পদত্যাগের নির্দেশ দেন যাতে ঐ রাজ্যগুলিতে অনতিবিলম্বে বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে। কয়েকটি রাজ্যসরকার এই কেন্দ্রীয় নির্দেশের বিরোধিতা করে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিলেন কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট জনতা সরকারের নির্দেশকে বৈধ ঘোষণ করেন। ফলে ১৯৭৭ সালের জুন মাসে নয়টি রাজ্যে বিধানসভার অন্তর্বর্তী নির্বাচন হয়।

জনতা সরকারের পতনের পর ১৯৮০ সালে লোকসভার অন্তর্বর্তী নির্বাচনে কংগ্রেস জয়ী হয়ে যখন ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন করে তখন আবার যেসব জনতা শাসিত রাজ্যে কংগ্রেস জনতাকে পর্যুদস্ত করেছিল সেসব রাজ্যে বিধানসভার অকাল নির্বাচনের ব্যবস্থা হয়। এবারও নয়টি রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং এই রাজ্যগুলির বেশীর ভাগই ছিল যেখানে ১৯৭৭ সালেও বিধানসভা নির্বাচন হয়েছিল সেই রাজ্যগুলি। পশ্চিমবাংলা অবশ্য এক বড় ব্যতিক্রম। এ রাজ্যে ১৯৭৭-এর লোকসভা নির্বাচনের ও ১৯৮০-র নির্বাচনের ফলের বিশেষ তফাৎ ছিল না; ১৯৭৭-এ কংগ্রেস পেয়েছিল তিনটি আসন, ১৯৮০তে চারটি। তাই ১৯৮০তে আর এ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের প্রয়োজন হয়নি।

১৯৭৭ ও ১৯৮০-র লোকসভা নির্বাচনে কেন্দ্রে ক্ষমতা বদল হয়েছিল। ১৯৮৪তে হয়নি। কাজেই এবার লোকসভা নির্বাচনের সঙ্গে তাল রেখে রাজ্যে রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন করবার প্রয়োজন হয়নি। পশ্চিম বাংলায় কংগ্রেস ১৯৮০-র চেয়ে অনেক ভাল ফল করলেও তুলনায় এবারও বামফ্রন্টের ফল ভালো। একমাত্র কর্ণাটকেই ১৯৮৩-র বিধানসভা নির্বাচনের তুলনায় কংগ্রেস অনেক ভালো ফল করেছে। রাজীব গান্ধী কিন্তু ১৯৭৭ ও ১৯৮০র নজির

অনুসরণ করতে চাননি। তা সত্ত্বেও কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী রামকৃষ্ণ হেগড়ে অন্তর্বর্তী নির্বাচনের পথ বেছে নিয়েছেন, অন্ধ্র প্রদেশের রাম রাও-ও দলীয় কারণে অন্তর্বর্তী নির্বাচনে নেমেছেন। তাছাড়া ১৯৮০-র জুনে যেসব রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন হয়েছিল সেসব রাজ্যে এবছরের জুন মাস পর্যন্ত অপেক্ষা না করে মার্চেই নির্বাচন করা হচ্ছে। মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে যে ১১টি রাজ্য ও একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে বিধানসভা নির্বাচন হচ্ছে সেখানে সুস্থিত সরকার গঠিত হলে ১৯৯০ সালের আগে আর বিধানসভা নির্বাচনের প্রয়োজন হবে না। সেক্ষেত্রে ভেবে দেখা যেতে পারে এই সব বিধানসভা নির্বাচনগুলি ১৯৮৯-র লোকসভা নির্বাচনের সংগে করা যায় কি না। তাহলে দেশের অন্ততঃ একটি বড় অংশে পাঁচ বছরে দুবার সাধারণ নির্বাচনের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। তবে মার্চ নির্বাচনে যদি সুস্থিত সরকার গঠিত না হয়তো আলাদা কথা।□

শিলিগুড়ি পরিবহনঃ

ভবিষ্যৎ অন্ধকার

সুশান্ত আচার্য

শহর শিলিগুড়ির পরিবহন ব্যবস্থা ক্রমাগত এক দু:স্বপ্নময় বন্ধ্যাদশায় গিয়ে স্থির হতে চলেছে। পরিসংখ্যানে বোঝা যায় ভৌগোলিক ও ব্যবসায়িক গুরুত্বের দিক থেকে শিলিগুড়ি পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় শহর। অথচ পরিকল্পনা উদ্যোগ ও প্রয়োজনীয় সুযোগের অভাবে একটা উঠতি শহরের শিরা-উপশিরা বলতে যে রাস্তাঘাট ও পরিবহন ব্যবস্থাকে বোঝায় তা একেবারেই নগণ্য। পরিকল্পনাহীন ভাবে ব্যবসায়িক প্রয়োজনে হঠাৎ গড়ে ওঠাটাই এই শহরের প্রথম অভিশাপ। ১৯০১ সালেও এই শহরের জনসংখ্যা ছিলো মাত্র ৮ থেকে ৯ শ'ত বেশি না, ১৯২৫ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৯ হাজারে, অথচ ১৯৮১ সালে শিলিগুড়ির লোকসংখ্যা বেড়ে হয়েছে দেড় লক্ষেরও বেশি। বৃহত্তর শিলিগুড়ির কথা ধরলে পাঁচ লক্ষের বেশি। একটি পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় (১৯৩১-৬১) সালে নিম্নোক্ত স্থানগুলির লোকসংখ্যা নিম্নোক্ত হারে বেড়েছেঃ

শহর	শতাংশ
কলকাতা	১৪০
আসানসোল	২৩০
শিলিগুড়ি	৯৭৯

শিলিগুড়ি বাদে ভারতের অন্য কোনও শহরে ওই সময় সম্ভবত এই হারে জনসংখ্যা বাড়ে নি। এই শহর যে কত অবিন্যস্ত এবং বেহিসেবী ভাবে বেড়ে উঠেছে তা আঁচ করা যায় এর আয়তন নিয়ে সংশ্লিষ্ট মহলের মতদ্বৈধতা থেকে। সরকারি হিসেবে এর আয়তন ২১ বর্গ কিমি। বৃহত্তর শিলিগুড়ির আয়তন ২৭ বর্গ কিমি। পৌরসভার হিসেবে আয়তন মাত্র ৯ বর্গ কিমি। শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন পর্যায়ের হিসেব অস্থায়ী বৃহত্তর শিলিগুড়ির আয়তন ৮০ বর্গ কিমি। সে যাইহোক ২১ বর্গ কিমির ওপর একটা শহর সৃষ্টি হয়েছে। শিলিগুড়ি একটি বাজার শহর। ভৌগোলিক অবস্থানের ওপর একটা শহরে অর্থনৈতিক বুনিয়াদ দানা বাঁধে এবং তা বিবেচনা করলেই শহরের গুরুত্ব বোঝা যায়। ভূ-রাজনৈতিক অবস্থানের কথা ধরলে নেপাল ভূটান ও সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতে যাওয়া আসার এটাই প্রধান দরজা। পাশেই আছে বাংলাদেশের সীমান্ত। বিহার ও পাহাড়ী রাজ্য সিকিম তো আছেই। শিলিগুড়ির পাইকারি ব্যবসার প্রধান দুটো কেন্দ্র হলো খালপাড়া ও নতুন সেবক রোড। সেবক রোডের ব্যবসায়ীরা সর্বভারতীয়।

মারোয়াড়ী, পাঞ্জাবী, সিন্ধ্রীর বিহারি, গুজরাটি ও কিছু বাঙালি। খালপাড়া প্রধানত মাড়োয়াড়ী অধ্যুষিত। পাইকারি ব্যবসাদারদের একটি অংশ কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যবসায়ের সিংহভাগ দখল করে আছেন। তাঁদের পরিভাষায় 'একচেটিয়া' বলা হয়। খাদ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে এই একচেটিয়া ব্যবসা মারাত্মক রকম। শিলিগুড়ির ৬ শতাংশ খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসায়ী ৪০ শতাংশ বাজার দখল করে আছেন। মাত্র ৭-৮ জন ব্যবসায়ী ৯৫ শতাংশ কাগজ ও স্টেশনারীর বাজার দখল করে আছেন। এ ছাড়াও ছোট ছোট পাইকারি ব্যবসায়ীদের বার্ষিক বিক্রি ১০ থেকে প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা।

এই নয়া ব্যবসায়ী কেন্দ্রিকতা চরিত্রের দিক থেকে জমিদার তন্ত্রের থেকে আলাদা। জমিদারেরা শহর ও গ্রামের উন্নতির কথা ভাবতেন বা করতেন। কিন্তু এঁরা চিরদিনই বহিরাগত ব্যবসায়ী থেকে যান। স্থানীয় সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামান না; শুধুমাত্র নিরাপত্তার কথা বাদ দিলে। প্রয়োজনে মস্তান পোষেন ও রাজনৈতিক দলকে চাঁদা দেন। এঁরা চিরদিনই বাইরের লোক থেকে যান এটা প্রায় সর্বভারতীয় অবস্থা। যেখানে সারা আসানসোলে দোকানের সংখ্যা ৭৮০, সেখানে শিলিগুড়ির একটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলেই দোকানের সংখ্যা ১৫৪৬। প্রত্যেক স্কয়ার ফুট জায়গায় শিলিগুড়িতে দৈনিক কেনাবেচা ১৮-২২ টাকা। আসানসোল-দুর্গাপুরে ১০ টাকার বেশি নয়। তাই শিলিগুড়ি বাজার শহর। এই শহরে দোকানের অর্ধেকই অননুমোদিত। আর ৮০ শতাংশ দোকানই ১৯৬০ সালের পর তৈরি। বিভিন্ন ধরনের দোকানের একটি শতাংশের হিসেবঃ

দোকান	শতাংশ
খাদ্যদ্রব্য	২৮
পান-বিড়ি-চা	১৩
জামাকাপড়	৯
হোটেল-রেস্তোরাঁ	৬
কাগজ-স্টেশনারী	৫
ঘর বাড়ী তৈরির দোকান	৪
ইলেকট্রিক ও ট্রান্সপোর্ট	৪
ঔষধ	২

ওপরের হিসেব দেখলেই এই শহরের চাহিদার ধরন বোঝা যায়। শিলিগুড়ির পাশেই নেপালের সীমান্ত থাকায় ও বেকারত্ব প্রকট হওয়ায় অর্থনীতিতে তথাকথিত informal sector গড়ে উঠছে। এ ছাড়াও পার্শ্ববর্তী জেলা জলপাইগুড়ির কয়েকটি অঞ্চল, ২ নম্বর ডাবগ্রাম, ফুলবাড়ি ১, চম্পাসারি, শালুপাড়া ও মাটিগাড়া এই শহরের গা ছুঁয়ে আছে। ওই অঞ্চলগুলির প্রায় ৩ লক্ষেরও ওপর মানুষের জীবন ও জীবিকা শিলিগুড়ি-নির্ভর। ওই অঞ্চলগুলিই এখন শিলিগুড়ির বর্ধনশীল আবাসিক এলাকা। এই সব জায়গা থেকে অশিক্ষিত বেকার লোকেরা সারাদিন শিলিগুড়িতে বিভিন্ন রকম মরশুমী ব্যবসা কোনরকম কর ছাড়াই করে থাকেন। রিক্সা-ঠেলা চালান। শিলিগুড়ির লোকসংখ্যা দু'লক্ষের বেশি নয়। পার্শ্ববর্তী জেলার ওই অঞ্চলগুলির মানুষেরাই দিনের বেলায় শিলিগুড়িতে ভিড়ের ঢল নামায়। এছাড়া বাইরের লোক তো আছেই। পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলির ওপর কোন প্রশাসনিক ক্ষমতাও পৌরসভার নেই। পৌরপতি স্বপন সরকার এই প্রসঙ্গে বহুবার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলির অঞ্চল সদস্যদের ডেকেছেন ও দুই জেলার জেলা শাসককেও জানিয়েছেন। প্রধানতঃ অঞ্চলের রিক্সা সমস্যা সমাধানের জন্য এখনও সেরকম কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হয়নি। শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যালিটির লাইসেন্সপ্রাপ্ত রিক্সার সংখ্যা যেখানে মাত্র ৩ হাজার সেখানে পাঁচটি অঞ্চলের রিক্সার পরিমাণ প্রায় ৭ হাজার। কিছু লাইসেন্সহীন রিক্সাও রয়েছে। সব মিলিয়ে প্রতিদিন এই শহরের রিক্সা চলে ১২ হাজারের মতো। অথচ রিক্সা সংকট প্রায় সারাদিনই থাকে- বিকেল পাঁচটার পর তা মারাত্মক আকার ধারণ করে। এখন রিক্সা পাওয়াই যায় না। এর মূল কারণ পৌরপতির মতে শিলিগুড়িতে চলাচলকারী ৭৫% রিক্সার ওপর পৌরসভার কোন নিয়ন্ত্রণ নেই।

আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত শহর পরিকল্পনা অনুযায়ী একটি শহরের আয়তনের ২০ থেকে ২৫ শতাংশ রাস্তা থাকা প্রয়োজন। যা শহরের সমস্ত রকম বেড়ে ওঠাকে অব্যাহত রাখতে পারবে। যানজট পরিবেশ দূষণ ও ঘন ঘন দু:খজনক দুর্ঘটনা ঘটবে না। দিল্লি ও বোম্বাই শহরে রাস্তা আয়তনের ২০ শতাংশ, মাদ্রাজে ১৫ এবং কলকাতায় ৭-এর কিছু কম। সেই

তুলনায় 'বৃহত্তর শিলিগুড়ির ২.৯%। পৌরসভার তথ্য অনুযায়ী পাকা রাস্তা ১১৪ কিমি ও কাঁচা ৩ ১/২ কিমি। অথচ পূর্ত বিভাগের সংজ্ঞা অনুযায়ী খুব বেশি হলে সব রকম গাড়ি বহনকারী রাস্তার পরিমাণ ২২ কি: মিটারের বেশি নয়। হাল্কা যান ও মানুষ চলাচলের জন্য তৈরি রাস্তা দিয়েই অনবরত ভারি ট্রাক ও অন্যান্য যানের যাতায়াত আছে। এতে যে রাস্তা পৌরসভার হিসেব অনুযায়ী দু'বছরের সারানোর কথা তা মাত্র দু'মাসেই খতম হয়ে যাচ্ছে। শিলিগুড়িতে সব রুটে সিটি বাস চালানোর সবচেয়ে বড় বাধা হলো এইটিই। বাস চালাতে গেলে কম করে ১৬' পুরু ও ১২' থেকে ১৩' ফুট চওড়া রাস্তার প্রয়োজন। অথচ ব্যাপক ও জরুরীভিত্তিক অধিগ্রহণ ছাড়া তা কোনমতেই সম্ভব নয়। শিলিগুড়ির অধিকাংশ রাস্তায় বিশেষ করে মহাবীর স্থান সহ বিভিন্ন জনবহুল অঞ্চলে রাস্তা ঘেঁষে পাকা সিঁড়ি তৈরি হচ্ছে দোকান ঘরের কিংবা বসত বাড়ির।

অন্ধকার ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখেও কিছু আশার আলো দেখাতে চাইলেন শিলিগুড়ির পৌরপতি। শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন পর্ষদকে কাজে লাগিয়ে যৌথ উদ্যোগে গুরুত্বপূর্ণ বর্ধমান রোডকে চওড়া করে পার্কিং স্পট তৈরি করা হয়েছে। স্টেশন ফিডার রোডেও অনুরূপ কাজ হয়েছে। স্টেশন ফিডার রোড থেকে বর্ধমান রোডের সংগে যোগাযোগকারী বিবেকানন্দ রোড ও মন্টু রাম রোড দুটিকে বড় করে ভারি গাড়িগুলোকে ওইদিক দিয়ে পার করার ব্যবস্হা করা হয়েছে। এতে মহাবীর স্থানের যানজট কিছুটা কমতে পারে। গত ১৯ জানুয়ারি দুই জেলার উচ্চ পর্যায়ের সরকারি অফিসারদের এক বৈঠকে ঠিক হয় পরীক্ষামূলকভাবে হিলকার্ট রোডে কয়েকটি ট্রাফিক আইল্যান্ড বসানো হবে। এছাড়াও শহরের মূল রাস্তা হিলকার্ট রোডের আধুনিকীকরণের কাজ শুরু হয়েছে। খরচ ধরা হয়েছে ২৬ লক্ষ টাকা। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী হিলকার্ট রোডকে মধ্যস্হলে আয়র্ল্যান্ড বিশিষ্ট একটি টু-ওয়ে সিক্স লেনে পরিণত করা হবে। রাস্তার দু'দিকেই মোট তিনটি করে ৬টি রাস্তা থাকবে, ৩টি যাওয়ার ৩টি আসার। ৩টির মধ্যে একটি ফুটপাথ, একটি কম গতি-সম্পন্ন গাড়ির চলার রাস্তা ও একটি দ্রুতগতিসম্পন্ন গাড়ি চলার রাস্তা। এসব কিছুকে সাধুবাদ জানিয়েও প্রশ্ন থেকে যায়, তাতে কি শহরের চলাচলের মূল সমস্যার সমাধান হবে? কেননা রাস্তার পরিমাণ বাড়ছে না। আর রিক্সাই বলুন বা অটো রিক্সাই বলুন তা কোনদিনই কোন শহরের সংখ্যাগরিষ্ঠ নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর যানবাহন হতে পারে না। বর্তমান অর্থনৈতিক কাঠামোতে উক্ত শ্রেণীর গড়পড়তা দৈনিক যানবাহন খরচ দেড় থেকে দু'টাকা এবং তা দিয়েই তাকে কমপক্ষে ৫ বর্গ কিমি রাস্তায় সারাদিনের চলাফেরা সারতে হয়। অবশ্যই শিলিগুড়ির রিক্সা ভাড়া পশ্চিমবাংলার অন্য শহরের তুলনায় অনেক কম তাই রক্ষা। কিন্তু এ অবস্হা চিরদিন থাকবে না, আর মিটার বসানো অটো রিক্সায় যাতায়াত করতে গেলে দৈনিক ৮ থেকে ১০ টাকা পরিবহন খাতে ব্যয়িত হবেই। এই ক্ষমতা যাঁদের আছে তাঁরা স্কুটার কিনবেন। অতএব হাতে থাকলো সিটি বাস। কিন্তু সিটি বাস উত্তরবংগে সর্বপ্রথম শিলিগুড়িতে চললেও বর্তমান রাস্তাঘাটের অবস্হায় তার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। পৌরপতি বললেন, ব্যবসায়ীরা প্রথম প্রথম লাভ হবে না এই ভয়ে বাস নামাতে পারছেন না। মাত্র দুটি বাস চলছে। এদের রুট নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে ছেড়ে বর্ধমান রোড ও হিলকার্ট রোড হয়ে কাছারি মোড়। ভাড়া পঞ্চাশ পয়সা। এছাড়া শহরের ভেতরে বাস ঢুকলে কোথাও যদি একবার তা ফেঁসে যায় তবে বেরুনো মুস্কিল। ১৯৮২ সালে প্রথম সিটি বাস প্রসংগ তোলেন আঞ্চলিক পরিবহন অফিস, তারপর ১৯৮৪-র পুজোর আগে রিক্সা ধর্মঘটের মোকাবিলা করতে চারটি সিটি বাস শহরের বিভিন্ন রাস্তায় চালানো হয়। এবং তাতে বাস্তব অসুবিধা চালকেরা বুঝতে পারেন। ব্যাপক অধিগ্রহণ ও নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন তুললে পৌরপতি বলেন বড় বড় পরিকল্পনায় না গিয়ে স্বল্প ক্ষমতার মধ্যে কতটুকু করা সম্ভব তা নিয়ে আলোচনার জন্য ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ি প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব নেওয়া হবে। এবং এই বিশেষ সমস্যাটির ওপর কিছু গাইড লাইন স্হির করে দলমত নির্বিশেষে একটি নাগরিক সম্মেলন ডেকে তাঁদের গঠনমূলক উপদেশ নেওয়ার কথাও পৌরপতি ভাবছেন। এদিকে অন্য কয়েকটি সূত্র থেকে যা খবর পাওয়া গেছে, পৌর আইন অনুযায়ী আগে দখল পরে ক্ষতিপূরণের আইন গ্রামাঞ্চলে ধানী জমির ওপর খাটে। শহরে খাটে না।

পৌর আইন অনুযায়ী আগে ক্ষতিপূরণ পরে দখল আইনে দখল করতে গিয়ে দেখা গেছে জায়গা দেবার ইচ্ছে থাকলেও জমি অধিগ্রহণ শাখার নির্ধারিত জায়গার দাম বাস্তব দামের চেয়ে ভীষণ কম হওয়ায় কেউ জমি ছাড়তে রাজী হচ্ছে না। জোর করতে গেলে কোন একজন দু'ফুট জায়গার মালিক আদালতে গেলেই ইনজাংশন হয়ে গোটা রাস্তার পরিকল্পনাই ভেস্তে যাচ্ছে। কথাপ্রসংগে পৌরপতি তার অসহায়তার কথা কবুল করলেন; অধিগ্রহণ ও শহরের অভ্যন্তরীণ রাস্তায় ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে। তিনি এ ব্যাপারে পুলিশ, আর টি-এর সহযোগিতা প্রার্থনা করেছেন। কিন্তু বাস্তবত: তাদের পক্ষেও তা সম্ভব হচ্ছেনা ব্যবসায়ীদের সর্বজনবিদিত আর্থিক

প্রভাবের জন্য। আর নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে কড়াকড়ি করতে গেলে পাড়ার মোড়ে মোড়ে ট্রাফিক মোতায়েন করা দরকার ওয়ে ব্রিজ সম্পন্ন। অত পুলিশ ও অর্থ কোথায়? রাস্তা সারাতেই নাস্তানাবুদ হচ্ছে পৌরসভা। শিলিগুড়িতে মোট কথা রাস্তার পরিমাণ বাড়ানো যাবে না; কারণ শহরটি নদীবেষ্টিত। বছর পাঁচেক আগের পূর্ত বিভাগের একটি সার্ভের ফলে জানা গেছে জলপাই মোড় থেকে সোজাসুজি রাস্তা নিয়ে যেতে পারলে নর্থবেংগল মেডিকেল কলেজের দূরত্ব ১৩ কি: মিটার থেকে কমে মাত্র ২.২৩ কি: মিটারের মধ্যে আসতো। কিন্তু তা সম্ভব হচ্ছে না 'মহানন্দা' ও 'বালাসন' নদী দুটির জন্য। মেডিকেল কলেজের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসা কেন্দ্র থেকে শহর শিলিগুড়ি এত দূরে রয়েছে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক অক্ষমতার জন্য প্রাকৃতিক বাধাকে অতিক্রম করা যাচ্ছে না বলে। এই সমস্ত বাধাই অতিক্রম করা যেতো একটি মাত্র রাস্তায় আর তা হলো ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট গঠন। যে ট্রাস্টের হাতে রাজ্যপালের দেওয়া জরুরী প্রয়োজনভিত্তিক অধিগ্রহণের চরম ক্ষমতা থাকবে। যা আছে সি আই টি-র মত, যার ফলে বড় বাজারের মতো জায়গায় এতসব কান্ডকারখানা ঘটে যেতে পারছে অবলীলায়। ট্রাস্টের বিরুদ্ধে কোন রকম আপীল অথবা ইনজাংসন চলে না আদালতে। আর এই জাতীয় ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট গঠন করলেই বিশ্ব ব্যাংকের টাকাও প্রয়োজনে এসে পৌঁছুবে এই শহরের উন্নতিকরণে। তখন আর অর্থ কিংবা ক্ষমতার অভাবে হাত কামড়ে রক্তক্ষরণ ঘটাতে হবে না অসহায় ভাবে' স্বল্প ক্ষমতার জন্য আধুনিকীকরণের ভাবনা ভূতের মতো পেছনে না হেঁটে জ্যান্ত মানুষের মতোই উজ্জ্বল শহর পরিকল্পনার দিকে এগিয়ে যাবে। □

ধারাবাহিক

নূপুরের মতো

অনুলিখন ঃ অনুপমা দাশ

আঠার

ইটালি ট্যুর শেষে আবার ফিরে এলাম প্যারিসে মাদাম মিয়ারের বাড়িতে। এবার যেন ভিড় লেগে গেল ভারতীয় নাচ শিখবার জন্য।

এই লেসন দিতে গিয়ে একবার বেশ বিপদেই পড়ি। সাধারণত সবাই আমার আবাসে এসেই শিখতো। কিন্তু একটি মেয়ে কোন অসুবিধার দরুণ এসে শিখতে পারবে না, তাকে বাড়িতে গিয়ে শেখাতে হবে। তার আগ্রহ এত বেশি যে অতিরিক্ত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে সে অনুরোধ জানাতে এসেছিল আমার কাছে।

তার আগ্রহ দেখে রাজি হলাম। ওরে বাবা, সেই শহরতলির এক জায়গায় একটি বিশাল বাড়ি। তার দরজা খুলে দিল মেয়েটি। বিরাট বিরাট ঘর। পুরনো আমলের দামি-দামি আসবাব, সুন্দর সাজানো চারিদিক। আভিজাত্য ও সুরুচির ছাপ সর্বত্র। তারপর এঘর ওঘর পার করে মেয়েটি শেষে আমাকে নিয়ে এলো এক বড় হল ঘরে। সেইখানেই ও লেসন নেবে। কিন্তু এতটা যে সময় গেল, আমি দ্বিতীয় কোন প্রাণী দেখতে পেলাম না। তাছাড়া আলোটাও যেন বড় কম সব ঘরে। শুনে হয়তো হাসি পাবে, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি ঐ পরিবেশে হঠাৎ কেমন যেন বোধ হলো। গা টা ছম্‌ছম্‌ করে উঠলো। একটা বিশ্রী ভয় যেন শিরদাঁড়া দিয়ে উঠে সর্বাঙ্গে শিহরণ সৃষ্টি করলো।

কোন রকমে লেসন দিয়ে চলে এলাম। পরদিন শহর থেকে ফোন করে জানিয়ে দিলাম যে, আমার পক্ষে বাড়িতে গিয়ে শেখানো সম্ভব নয়। তারপর অনেক দিন সেই বাড়িটার ভিতরকার ঐ পরিবেশ, ঐ নির্জনতা আমি ভুলতে পারিনি। সবচেয়ে আশ্চর্য লেগেছিল যে মেয়েটি কোন কিছু বললে না। ভদ্রতার খাতিরে এতটাও তো বলতে পারতো যে, কোন কারণে বাড়ির আর সবাই বাইরে গেছেন, বা এমনি কিছু একটা। ওর হাবভাব দেখে মনে হয়েছিল যে, ঐ নির্জন ভুতুড়ে পরিবেশেই ও থাকতে অভ্যস্ত।

যাই হোক, মাদাম মিয়ারের বাড়িতে থাকতে শুরু করেছিলাম গেস্ট হিসাবে। কিন্তু অনেক দিনতো হয়ে গেল। তাছাড়া হাতে টাকা-পয়সাও যখন আসছে, তখন মাদামকে বাড়িভাড়া বাবদ কিছু দেওয়া উচিত। মাদাম মিয়ার কিছুতেই নেবেন না। আমার প্রস্তাবে প্রায় কান্না-কান্না, সুরে বললেন ইট'স প্লেজার উদয় টু হেলফ ইউ। প্লিজ লেট মি গো ওন ডুইং ইট।

এরপর আর কি করা যায়? তবুও জোর করেই তাঁর সঙ্গে একটা রফা করলাম। কারণ শুধু তো থাকতে দেওয়া নয়, এটা-ওটা রান্না করে খাওয়ানো, আমার সব প্রয়োজনের দিকে নজর রাখা এবং অনেক লোকের সঙ্গে জানাশোনা করিয়ে দেওয়া, এসবও তিনি করতেন। একবার তাঁর উদ্যোগে আমি শো-দিয়েছিলাম।

শুধু মাদাম মিয়ার নন, দিনে দিনে কতো লোকের সঙ্গে আলাপ হতে লাগলো, তাদের সকলের কাছ থেকে স্ত্রী, পুরুষ নির্বিশেষে এক ঘরোয়া সমাদর ও এক আন্তরিক ব্যবহার পেতে লাগলাম। সে ব্যবহার আমার মনের দিকে ও বাইরে জগতে বা বাস্তব ক্ষেত্রে সমানভাবে উপকার দিয়েছে। তার জন্য আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞ। তাঁদের সেই নিঃস্বার্থ ভালবাসা বা শ্রদ্ধা যে কত খাঁটি তা বলে বোঝাতে পারবো না।"

দাদা বলে চললেন, 'ব্যারন দ্যু রথচাইল্ড বিশ্বের অন্যতম ধনী ব্যাঙ্কার। তাঁর বাড়িটা একটা বিরাট প্রাসাদের মত। এ ধরণের লোকেরা শুধু যে অগাধ টাকা-পয়সার মালিক তা নন, এঁরা সত্যিকারের শিক্ষিত, রুচিপূর্ণ ও বিত্তবান লোক। জ্ঞানের নানান ক্ষেত্রে তাঁদের অগাধ বিচরণ। সেই ব্যারন দ্যু রথচাইল্ড একদিন তাঁর বাড়ীতে নাচের অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। ইজিপ্ট-এর ডান্সার শ্রীমতী নিয়তাই নিয়কা ও আমি উভয়েই আমন্ত্রিত হয়েছিলাম।

সেখানে গিয়ে দেখি শুধু তাঁর পরিবারের লোক নয়, সেখানে সমবেত হয়েছেন তাঁদের সমশ্রেণী বহু সম্ভ্রান্ত নরনারী। এক মনোরম আভিজাত্যপূর্ণ পরিবেশে এসে মনটা ভরে গেল।

ইদানীং অনেক নাচ নতুন নতুন ভাবে মাথায় আসতো। তার মধ্যে 'ইন্দ্র' অন্যতম। কেবল ওয়েভ-এর ধরণে হাতের কাজ ও দাদরা ছন্দের উপর এই নাচটি। পোশাক ধুতি, পায়ে ঘুঙুর, মাথায় মুকুট ও গলায় পৈতা। নাচটা তৈরি করলাম প্যারিসে বসে-বসে। এরপর উনিশ শ' উনত্রিশের শেষের দিকে যখন ভারতে ফিরে আসি, তখন দক্ষিণ ভারতে এক লাইব্রেরিতে ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রের বইয়ের এক বিশেষ অধ্যায়ে এই ওয়েভের ধরণে হাতের কাজের উল্লেখ দেখতে পাই। নৃত্যের ভঙ্গিতে এমনভাবে পেশি সঞ্চালনের কথা ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রে রয়েছে দেখে মনে-মনে সেদিন একটা স্বস্তি ও নিশ্চিন্তবোধ করেছিলাম। কারণ কিছু না জেনে বিদেশে বসে শুধু কল্পনার উপর ভর করে যে নৃত্য একদিন জন্ম নিয়েছিল তা যে সর্বাঙ্গীনভাবে ভারতীয় হয়েছিল, সেই আনন্দেই আমার বুক ভরে গিয়েছিল। আর সেই 'ইন্দ্র' নাচের যে সাফল্য আমি লাভ করেছি তা দেখে বারবার এটাই অনুভব করেছি যে ভারতবর্ষ অনেক বড়, অনেক মহান এবং আমি মনে-প্রাণে ভারতীয়।

ব্যারণ দ্যু রথচাইল্ড-এর বাড়িতে সেই সন্ধ্যায় আমি এই 'ইন্দ্র' নাচই করেছিলাম। ওখানকার পিয়ানো বাদককে বুঝিয়ে দিলাম সুরটা। নাচটা সাড়ে চার মিনিটের।'

সাড়ে চার মিনিটের 'ইন্দ্র' নাচ যেন স্বর্গের সুষমা নিয়ে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল চারিদিকে। আর সমবেত দর্শকবৃন্দ, মুগ্ধ বিস্ময়ে আকণ্ঠ পান করলেন সেই স্বর্গীয় রস। বোধহয় একেই বলে এক পরিবেশ সৃষ্টি করা, যে পরিবেশে দর্শকের মন বা চেতনা শিল্পীর রসবোধ বা চেতনার সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। সেদিন অকুণ্ঠ প্রশংসার পরে ব্যারণ দ্যু রথচাইল্ড দিলেন পাঁচ হাজার ফ্রাঙ্কের এক চেকের উপহার।

নিজের উপার্জনে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলার প্রথম সুযোগ হলো দাদার এই পাঁচ হাজার ফ্রাঙ্কে।

ডাক্তার শর্মা নামে এক ভারতীয় সে সময় প্যারিসে বেশ সাফল্যের সঙ্গে ডাক্তারী করছিলেন। শুধু তাই নয়, যে সব ভারতবাসী প্যারিসে বেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, তাঁদের সঙ্গেও ডাঃ শর্মার হৃদতা ছিল। এমনকি প্রবাসী কিছু রাজপরিবারের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল ডাক্তারির সূত্রে। ভারতীয় সে সব রাজপরিবারের মাধ্যমে উচ্চ সম্ভ্রান্ত ফরাসি সুধীজনের সঙ্গেও ডাঃ শর্মা পরিচিত ছিলেন।

এই ডাঃ শর্মা একদিন আমন্ত্রণ জানালেন দাদাকে একটি বিশেষ সমাবেশে নাচ করার। ডাঃ শর্মার ক্লিনিকেরই সংলগ্ন এক ছোট্ট স্টেজ, আর ত্রিশ-চল্লিশটি দর্শকের আসন। এই স্বল্প-পরিসর জায়গায় অভিজাত দর্শকবৃন্দের সামনে ঘরোয়া পরিবেশে নাচ করলেন দাদা।

প্যারিসের ক্লিনিক, তায় আবার ডাঃ শর্মার

মত শৌখীন মালিক, কাজেই বেশ কিছু প্রস্ফুটিত গোলাপ গাছের টপ স্টেজের সামনে দিয়ে মাটিতে সাজানো ছিল। দাদার নাচ দেখে অভিভূত দর্শকরা টব থেকে গোলাপ ছিঁড়ে স্টেজের উপর ফেলতে লাগলেন। ছোট্ট স্টেজ, অচিরেই ভরে গেল গোলাপে। নাচের সময় পায়ের তলায় লেপটে গেল কত গোলাপ, আর পিছল হয়ে উঠলো স্টেজ। সাবধানে পা ফেলে সেদিন নাচ শেষ করলেন দাদা।

দর্শকমন্ডলীর মধ্যে সেদিন উপস্থিত ছিলেন কপুরতলার মহারাজা। উচ্ছ্বসিত প্রশংসার পর তিনি দাদাকে আমন্ত্রণ জানালেন বুয়া দ্য বুলোইনে তার স্যাতো মেদ্রিদ প্রাসাদে।

এমনি ভাবে প্রতিটি পদক্ষেপেই একটু একটু করে উপরে উঠতে লাগলেন দাদা। একা-একাই গেছেন নানান জায়গায় নিমন্ত্রণ রাখতে। দিনে-দিনে জনপ্রিয়তা ও সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে তিনি উঠতে লাগলেন। সুন্দর ভারতীয় নাচ ও সুন্দর ভারতীয় চেহারার একত্র সমাবেশ অভাবনীয় ভাবে বিদেশীদের মন-প্রাণ কেড়ে নিয়েছিল।

যাই হোক, এদিকে ছাত্রীদের মধ্যে মিশেল ও সিমন স্বাভাবিক কারণেই প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন দাদার কাছে -- তাদের পারদর্শিতার জন্য। তাদের সাহচর্যে সে সময় অনেক নতুন নাচের জন্ম হয় একক এবং যুগ্ম উভয় ভাবেই। গন্ধর্ব, রাধাকৃষ্ণ, হরপার্বতী এসব নাচের সৃষ্টি এ সময়ই। এবারের রাধাকৃষ্ণ নৃত্য আনা পাবলোভার সঙ্গে রাধাকৃষ্ণ নৃত্য থেকে একেবারেই আলাদা।

মাদাম রণজের সহযোগিতায় এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ভারতীয় নৃত্যের এক অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে ফরাসি দর্শকবৃন্দ অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁরা বিশবাসই করতে পারেননি যে 'রাজপুতবধূ' নৃত্যে কোন পুরুষ অবতীর্ণ হয়েছে।

অথচ দাদার কাছে শুনেছি যে, 'রাজপুতবধূ' নাচটি করা নিয়ে তিনি নাকি ভীষণভাবে নার্ভাস হয়ে পড়েছিলেন। অনুষ্ঠান আরম্ভ হবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর এক-এক বার মনে হয়েছে যে প্রোগ্রাম থেকে বাদ দিয়ে দেন 'রাজপুত বধূ' নৃত্যটি।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি করেছিলেন নাচটি এবং তাঁর একক নৃত্যগুলির মধ্যে এই নাচটি পরবর্তীকালে অন্যতম হয়ে উঠেছিল।

এই সময়ই সিমন ও মিশেল এক প্রাচ্যনৃত্য প্রতিযোগিতায় দুজনেই প্রথম স্থান অধিকার করে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পান।

ইতিমধ্যে জনপ্রিয়তা ও খ্যাতি বিপুলভাবে লাভ করেছেন দাদা, যার জন্য প্যারিসের বাইরেও প্রদর্শনীর জন্য লেখালেখি ও ডাকাডাকি আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। পড়াশুনার জন্য মিশেল আর নাচের দিকে বেশি সময় ও মন দিতে পারলেন না। তাঁর নৃত্যশিক্ষার সমাপ্তি ঘটলো অল্প কয়েকদিনেই। কিন্তু সিমন পুরোপুরি গ্রহণ করলো নাচকে। পিয়ানো বাদিকা থেকে ধীরে ধীরে দাদা তাকে করে নিলেন পার্টনার আর সিমন পরিচিত হয়ে উঠলেন সিমৃকী নামে। এই নামকরণও দাদাই করেছিলেন।

ভারতীয় নৃত্য প্রচারের যে দায়িত্ব অজ্ঞাতে দাদা নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন, এরপর থেকে ব্যাপকভাবে দ্রুতহারে যেন তার কাজ চলতে লাগলো।

প্যারিসের বিখ্যাত প্রাচ্য মিউজিয়াম 'মিউজেগিমে'। ভারতবর্ষ সম্পর্কে সশ্রদ্ধ উৎসাহী গিমে দম্পতি এর প্রতিষ্ঠাতা। ভারতবর্ষের নানা শিল্প ভাস্কর্য ও সংস্কৃতির বহু নিদর্শনের আকর এই 'গিমে মিউজিয়াম'। ভারতীয় নৃত্য ও ভারতীয় সংস্কৃতির এক বিশেষ রূপ। কাজেই মিউজিয়ামের নিজস্ব থিয়েটারে ব্যবস্থা হয় দাদার নাচের প্রদর্শনীর। মিউজিয়ামের সকল অভিজাত সভ্যদের জন্য এই অনুষ্ঠান। মাদাম গিমের অনুরোধে দাদা সাগ্রহে এই কাজটি নেন। ভারতবর্ষের প্রতি বা নিজের দেশের প্রতি এক গভীর ভালবাসা ও শ্রদ্ধাই দাদাকে বিনা পারিশ্রমিকে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের প্রেরণা জুগিয়েছিল। যদিও মাদাম গিমে বারবার অনুরোধ করেছিলেন কিছু গ্রহণ করতে। অভূতপূর্ব সাফল্যের পরেও আরো কয়েকবার দাদা ঐ মিউজিয়ামে শো দেন। দাদাকে এক বড় অঙ্কের চেক উপহার দেন তাঁরা। তার পরিমান কত এখন আর তা মনে নেই।

এরপর প্যারিসেই ভাড়া নেওয়া হলো এক স্টুডিয়ো। ঘন্টা হিসাবে এর ভাড়া, একটি পিয়ানোও রয়েছে সেখানে, নিজের মত কাজ করতে কত সুবিধা। প্রায় প্রতিদিনই সকালে দাদা চলে যেতেন এধরণের একটি স্টুডিয়োতে। মনের মধ্যে যত নতুন নতুন মুভমেন্ট আসতো একের পর এক বারবার অভ্যাস করে সেগুলিকে পাকা করে ফেলতেন। সম্পূর্ণ একা নিজের খেয়ালে কাজ করে চলেছেন দাদা। কখনও বা নিজেই গিয়ে পিয়ানোতে টুং-টাং করে তালটা বা সুরের

বয়স্কা এই মহিলাটির সঙ্গে আমার আলাপ হয় সুইজারল্যান্ডের জ্যুরিকের কুরশাল থিয়েটারে। ভদ্রমহিলা তাঁর পাঁচ-ছ'জন বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তাঁদের সঙ্গে পরিচিত হওয়া মাত্রই আমি অনুভব করলাম যে অতি সম্ভ্রান্ত ও মার্জিত রুচির কয়েকজন ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলার সঙ্গে আমার আলাপ হলো। এই সম্ভ্রান্ত কথাটা আমি টাকাকড়ির ব্যাপারে বললাম না। তাঁদের ব্যবহার ও কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে তাঁদের চারিত্রিক যে বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছিল তা অতি উচ্চস্তরের।

অমায়িক শ্রীমতী বোনারকে দেখে কেন জানিনা মনে হয়েছিল যে তিনি ফাইন আর্টস-এর প্রকৃত অনুরাগী। অথচ তাঁর সম্বন্ধে তখন আমি কিছুই জানতাম না।

তাঁরা বললেন যে, কুরশালে আমাদের নাচ দেখে তাঁদের খুব ভাল লাগে তাই তাঁরা আমাদের সঙ্গে পরিচিত হতে চেয়েছেন। শ্রীমতী বোনার বললেন, 'ভারত সম্পর্কে আমি বড় উৎসুক। সে দেশের শিল্প, ভাস্কর্য সম্বন্ধে আমি কিছু কিছু পড়াশুনা করেছি। কিন্তু কতটুকুই বা জানতে পেরেছি। ভারত কতদূর! তার সম্পর্কে কত বিস্ময়কর কথা শুনেছি, তার মহিমার তুলনা হয় না জগতে। আজ তোমার নাচ দেখে আমি যেন সেই বিস্ময়কর দিকটার কিছুটা আভাস পেলাম। তোমাদের দেশের বিষয়ে শোনা কথার অনেক কিছুই স্পষ্ট হয়ে উঠলো আজ। যেন ভারত অনেকটা এগিয়ে এলো কাছে।'

তারপর কথায় কথায় জানতে পারলাম তিনি নিজেও একজন শিল্পী। ভাস্কর্য তাঁর কাজের বিষয়।

এমনিভাবে প্রাথমিক আলাপ। তারপর লাঞ্চের আমন্ত্রণ আমাকে ও সিমকীকে গ্রহণ করতে হলো।

ধীরে-ধীরে সুইজারল্যান্ডের শোয়ের নির্ধারিত দিনগুলি শেষ হয়ে এলো। আমরা ফিরে এলাম প্যারিসে। ওখান থেকে যাবো জার্মানি, ইটালি ইত্যাদি জায়গায় শো দিতে।

মিস বোনার আমাদের আমন্ত্রণ জানিয়ে রাখলেন ভবিষ্যতে ছুটির সময়ে তাঁর জ্যুরিকের বাড়িতে দিন কাটানোর। আমরা প্যারিসে ফিরে এসেও আমাদের মধ্যে যোগাযোগ রইলো চিঠিপত্রের মাধ্যমে। প্যারিসেও তাঁর এক বাড়ি ছিল। তাকে বাড়ি না বলে স্টুডিয়ো বলাই ভালো। সেইখানেই উনি কাজ করতেন। বিভিন্ন ভঙ্গিমায় আমার কয়েকটি মূর্তি উনি নিজের হাতে গড়েছেন। তাঁর স্টুডিয়োর সংলগ্ন উদ্যানে আমার ও সিমকীর নানান ছবি উনি তুলেছেন। সেসব ছবির কিছু-কিছু আমরা ব্যবহার করতাম আমাদের শোয়ের

পাবলিসিটির জন্য। প্যারিস, জার্মানি বা অন্য অন্য জায়গায় আমাদের শোয়ের যে সব সমালোচনা বেরুতো সে সব পেপার কাটিং সংগ্রহ করা তাদের ইংরাজিতে অনুবাদ করে একটি খাতায় পর-পর রেকর্ডের মত সাজিয়ে রাখা এসব মিস বোনার করতেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে। সিমকী ও আমার সঙ্গে বসে-বসে কসটিউম তৈরি করাতেও কত সাহায্য করেছেন শ্রীমতী বোনার।

সবদিক দিয়ে মিস বোনার আমাদের এমনভাবে সাহায্য করতেন, যা থেকে একটা দরদ, একটা কাজের প্রতি ভালবাসা সর্বদাই ফুটে উঠতো। পরে জেনেছি এইটাই তাঁর স্বভাব। যেসব শিল্পী সবে নাম করছেন, নানা দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে সংগ্রাম করেও

যাঁরা পিছিয়ে পড়েননি, সে সব শিল্পীকেই এমনিভাবে আপন করে নিয়ে সাহায্য করেছেন মিস আলিস বোনার। আমাকে যেভাবে সাহায্য করেছেন, উনি সেতো শুধু আর্থিক সহায়তা নয়। আমার ম্যানেজারের দায়িত্বও তিনি প্রথম দিকে তুলে নিয়েছিলেন নিজের হাতে। আমি বরাবরই লিটারারি দিকে বড় অপটু। কি লেখায়, কি কথা বলায়! এখনও যেমন নানান ভাষা মিশিয়ে কথা বলি আমি, তখনও তেমনি ভাবে বলতাম, আর সেই ভাষার খিচুড়ি থেকে বেছে নিয়ে সুন্দর করে সাজিয়ে আমার আসল বক্তব্যটুকু লিখে ফেলতেন তিনি। তাঁর মাধ্যমেই চলতো আমার বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ রাখা। মিস বোনার ছিলেন উচ্চশিক্ষিতা। সবশুদ্ধ বারোটা ভাষায় ওঁর সমান দখল ছিল। কাজেই বিভিন্ন দেশের পেপার কাটিং রাখা, তার অনুবাদ করা এবং চিঠিপত্র লেখা সবই তিনি করতেন অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে।

'তাঁর সম্বন্ধে এত কথা কেন বলছি জানিস অনুপমা, এইসব ছোটখাটো ঘটনা থেকে তাকে বুঝতে পারবি বলে। তিনি যদি শুধু আর্থিক সাহায্য করতেন আমাকে, তাহলে এসব বলতাম না বা তাঁর প্রতি এতটা সশ্রদ্ধভাব আমার হতো না। কিন্তু যে ভাবে অন্তর দিয়ে তিনি আমাদের সঙ্গে সহায়তা করেছেন তাতে তাঁকে একটা আলাদা মর্যাদা দিয়েছিল সন্দেহ নাই। সত্যি কথা বলতে—আলিস বোনারের সঙ্গে দেখা না হলে আমার আর কখনও ভারতবর্ষে ফেরা হতো কিনা কে জানে? এমন কি আজ আমি যেখানে উঠতে পেরেছি বা আমি যা হয়েছি তাও সম্ভব হতো না কোনদিন, যদি শ্রীমতী বোনার আমার জীবনে না আসতেন। পরবর্তীকালে এলমহার্স্ট পরিবারের কাছ থেকে আমি যথেষ্ট অর্থ সাহায্য পেয়েছি আমার আলমোড়া সেন্টারের জন্য। আর সেজন্য আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞ বটে, কিন্তু যাই বল, অনুপমা, তাঁরা সাহায্য করেছেন যে উদয়শঙ্করকে, সে-উদয়শঙ্কর তখন ইউরোপ, আমেরিকায় শোয়ের পর শো দিয়ে বেড়াচ্ছে। চারিদিকের লোকজন তখন তাকে জানে, সম্মান করে। তখন তাঁর অধীনে এক নিজস্ব নৃত্যদল 'হিন্দু ব্যালেট্রুপ।'

আর আলিস বোনার সাহায্য করেছিলেন যে উদয়শঙ্করকে, সে উদয়শঙ্কর তখন সবে দৈন্যদশা কাটিয়ে উঠছে, একটা অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে সে বিদেশে দিন কাটাচ্ছে তখন। তখন তার অল্প-অল্প নাম হয়েছে। বড়-বড় থিয়েটারে বা অপেরায় নৃত্য প্রদর্শন করার মত নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি সে,—সেই সময় আলিস বোনার তাকে সাহায্য করেছেন পরিপূর্ণরূপে ফুটে উঠতে।

একটা আভাস পরীক্ষা করে দেখছেন। বেশ কয়েক ঘন্টা এভাবে চলার পর কাছেই কোন দোকান থেকে কিছু খেয়ে নিলেন। এখন আর অভাব নেই পয়সার, তবুও তাঁর খাওয়াটা ঠিক পরিপাটি যুৎসই হতো না। কারণ মাথায় তখন একের পর এক আসছে নতুন নতুন অভিনব মুভমেন্ট। সৃষ্টির আনন্দে আত্মহারা দাদা, সে সময় খাওয়ার দিকে মন দেবার সময় কই? প্রায় দিনই ষ্টুডিয়োতে এসে পড়েন সিম্‌কীও। তবে তাঁর আসতে একটু দেরি হয়। কারণ দৈনন্দিন পিয়ানো সাধনার অভ্যাস তাঁর ঘন্টা ছ'য়েকের। সিম্‌কী বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেছেন শোপানের উপর।

সিম্‌কী এসে পড়লে সে বসে পিয়ানো নিয়ে। তার হাতের সুরের ছন্দের সঙ্গে সঙ্গে স্রোতের মত নব-নব মুভমেন্ড সৃষ্টি করে চলেন দাদা। কাজের ফাঁকে ফাঁকে জল্পনা-কল্পনা চলে ফ্রান্সের বাইরে যাবার, শো দেবার। একদিন সিম্‌কী আসতেই হাতে একটা খাম নিয়ে উচ্ছ্বসিত আনন্দে প্রায় লাফাতে লাফাতে দাদা তাকে বললেন, 'বলতো সিম্, কি আছে এতে?'

দাদার কান্ড দেখে অবাক সিম্‌কীর বুঝতে বাকি রইলো না যে, নিশ্চয়ই খুব ভাল কোন খবর আছে, যা কিনা দাদার পক্ষে শুভ এবং তাই দাদার এত আনন্দ। তাই সিম্‌কীও খুশি।

খামের ভিতরের চিঠিতে ছিল সুইজারল্যান্ডে যাবার আমন্ত্রণপত্র। কয়েক দিনের মধ্যেই গোছগাছ করে তাঁরা তৈরি হলেন সুইজারল্যান্ড যাবার জন্য।

বড়-বড় দুটো স্যুটকেস, একটাতে জামা-কাপড়, অন্যটাতে শো-এর কসটিউম। এদুটো দাদার হাতে রইলো, আর অন্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসে ভর্তি একটি স্যুটকেশ রইলো সিম্‌কীর হাতে।

সুইজারল্যান্ডের সেই প্রথম ট্যুর দাদার জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সে প্রসঙ্গে দাদা বললেন, এই সুইজারল্যান্ডেই আমি এমন একজনের দেখা পেয়েছিলাম যিনি আমার মনের একান্ত আশা ও ইচ্ছাটিকে বাস্তবে রূপায়িত করতে সাহায্য করেছিলেন। তিনি আলিস বোনার। শিল্পী কূলের দরদীবন্ধু এই শ্রীমতী বোনার। এঁর বিষয়ে বিশদভাবে পরে বলবো।

যাইহোক, সুইজারল্যান্ডে প্রথমে আমাদের শো ছিল বার্ন শহরে। রবিবার সকালে শো। শহরের স্টেট থিয়েটারে সকাল সাড়ে আটটায় এই অনুষ্ঠান। রবিবার সকালে ইউরোপের বেশির ভাগ লোকেই উপাসনার জন্য যান গির্জায়। ফেরবার পথে সুবিধা মতন তাঁরা ঢুকে পড়েন কোন রঙ্গালয়ে।

এ তথ্য জানা থাকলেও মনে মনে ভেবেছিলাম সাত সকালে কে আবার আসবে শো দেখতে। যতই সময় এগিয়ে আসছে ততই বারেবারে উঁকি দিয়ে দেখছি। কিন্তু দর্শকদের আসন যে শূন্য পড়ে রয়েছে! তাহলে কি খালি থিয়েটারে শো দিতে হবে?

কিন্তু আস্তে-আস্তে দর্শক আসতে লাগলো একটি দুটি করে এবং সাড়ে আটটার আগে থিয়েটারটি পূর্ণ হয়ে গেল কানায়-কানায়। যখন যবনিকা উঠলো, তখন চেয়ে দেখি পরিপূর্ণ হল।

অনুষ্ঠানসূচীতে ছিল ইন্দ্র, গন্ধর্ব, কৃষ্ণপূজা, রাজপুতবধূ, রাধাকৃষ্ণ এবং আমার ও সিম্‌কীর ফোকডান্স। আর সবশেষে হরপার্বতী। এক একটি নাচের পর প্রচন্ড করতালি। সবশেষে 'হরপার্বতী'র পর যখন আমি ও সিম্‌কী দর্শকদের অভিবাদন জানাচ্ছি, সেই সময় আকস্মিকভাবে স্টেজের উপর উঠে এলেন এক ভারতীয় বাঙালি ভদ্রলোক। তিনি উঠে এসেই দর্শকদের উদ্দেশ্য করে বললেন, 'আমি একটি ভারতীয় ছবি তৈরি করেছি, আপনারা সকলে দয়া করে দেখতে আসবেন। ছবিটির নাম 'লাইট অব এশিয়া'।

ভদ্রলোকটির এহেন আকস্মিক ও অভদ্র আচরণে আমি স্বভাবতই আশ্চর্য ও বিরক্ত হয়ে গেছি। যদিও দেখামাত্রই আমি চিনতে পেরেছিলাম। কিন্তু লোকটিকে আমার শোয়ের মধ্যে প্রচার কার্য চালাতে দেখে আমি তো হতভম্ব। ভাবলাম, হয়তো স্টেজের ম্যানেজারের সঙ্গে জানাশোনা আছে, আর তাই লোকটি ঢুকেছে। কিন্তু ব্যাপারটা যে একটু বিসদৃশ তাতে সন্দেহ নাই। তবে এর চেয়েও আশ্চর্য হলাম জানতে পেরে যে লোকটিকে কেউই চেনেন না। ভারতীয় দেখে তারা মনে করেছেন যে, বোধ হয় আমার চেনাশোনা লোক। ভদ্রলোক এমনি আচমকা ও বিসদৃশ ব্যবহার করে আমার সঙ্গে একটিও কথা না বলেই বেরিয়ে গেলেন। সঙ্গে আবার তাঁর স্ত্রীও ছিলেন। মহিলাটিও ভারতীয়। কিন্তু সাজ-পোশাক দেখলে ইউরোপিয়ান মহিলা বলেই ভুল হয়।

এঁরা কে জানিস? সেই হিমাংশু রায় ও তাঁর স্ত্রী অভিনেত্রী দেবিকারাণী। যাঁদের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল একবার কসটিউমের ব্যাপারে লন্ডনে থাকাকালিন।

যাই হোক, বার্নের পর জুরিক। কুরশালে থিয়েটারে শো। এক রাতে অনুষ্ঠানের পর থিয়েটারের ম্যানেজার আমাদের জানালেন যে, এক ভদ্রমহিলা আমার ও সিম্‌কীর সঙ্গে আলাপ করতে চান। তিনি পাশের রেস্টুরেন্টে অপেক্ষা করছেন।

এই মহিলাটি শ্রীমতী আলিস বোনার। কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে তিনি অপেক্ষা করছেন। আমার জীবনে আমি বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ সম্পর্কে এত অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি যে দেখামাত্রই তারা কোন পর্যায়ের মানুষ তা বুঝতে পারতাম। এঁদের দেখেই আমার মনের মধ্যে একটা শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়েছিল। তারপর যতোই তার সঙ্গে আলাপ ঘনিষ্ট হয়েছে, ততোই দেখেছি তিনি সত্যিই মহীয়সী। তাঁর সম্বন্ধে সংক্ষেপে আসল কথাটি বলতে গেলে তাঁরই উদ্যোগে ও অর্থ সাহায্যেই আমি দশ বছর বাদে ফিরে এলাম ভারতে এবং নতুন করে নিজস্ব দল নিয়ে আবার ফিরে গেলাম প্যারিসে।

যাই হোক, জ্যুরিকে, শ্রীমতী বোনারের সঙ্গে আলাপ হবার পর আমরা ফিরে যাই প্যারিস এবং ভারতে ফেরার আগে আলাপ হলো বিষ্ণুদাস শিরালী নামে এক তরুণের সঙ্গে। সে এদেশে এসেছে সঙ্গীতশাস্ত্র বিষয়ে গবেষণা করতে।

তাকে আমার ভবিষ্যৎ আকাঙ্ক্ষার কথা বলতেই শিরালী সেদিনই উৎসাহ প্রকাশ করে আমাকে সহযোগিতা করার। ঠিক হলো যে সে আমাদের জন্য অপেক্ষা করবে প্যারিসেই আর আমি ফিরে এলে যোগাযোগ করে ট্রুপে যোগ দেবে।

এর কিছুদিন বাদে আমি ও শ্রীমতী বোনার 'দি গ্যাঞ্জেস' জাহাজে চড়ে রওনা দিলাম। সিম্‌কী রইলো প্যারিসে। সে আমাদের জন্য অপেক্ষা করবে।'

শ্রীমতী আলিস বোনার

।। দশ।।

'উনিশশ' উনত্রিশের শেষে দীর্ঘ প্রবাসের পর ভারতে ফিরে এলাম। এই ফিরে আসা এবং আবার ফ্রান্সে ফিরে যাওয়া—এসবের বিবরণ দিতে গেলে যাঁর কথা না বললে বিবরণ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে তিনি হলেন শ্রীমতী আলিস বোনার।

মিস বোনার ভারতকে ভালবেসেছিলেন মনপ্রাণ দিয়ে। আর তাই অগাধ সম্পত্তি ও পাশ্চাত্য জগতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে তুচ্ছ করে বারানসীর অশি ঘাটে এসে বসবাস শুরু করেছিলেন। সে অনেক বছর আগের কথা। এখনও তিনি সেখানে আছেন।

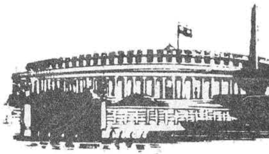

রাজধানীর কড়চা

অমৃত কুমার

নিরাপত্তার জন্য প্রধান মন্ত্রীর ছেলে মেয়েকে স্কুলে যেতে দেওয়া হচ্ছে না।

ইন্দিরা গান্ধীর হত্যার পর রাজীব গান্ধী এবং তাঁর পরিবারের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরো জোরদার করা হয়েছে। জানা গেছে প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্বে যাঁরা বর্তমানে রয়েছেন তাঁরা রাজীব গান্ধীর ছেলে এবং মেয়েকে স্কুলে যেতে দিতে অনিচ্ছুক। তাই বাধ্য হয়ে এখন রাহুল এবং প্রিয়াংকাকে বাড়িতেই পড়াশোনা করতে হচ্ছে।

স্বর্ণমন্দিরে সেনা অভিযানের আগে প্রধানমন্ত্রীর পুত্র ও কন্যা রাহুল ও প্রিয়াংকাকে দেরাদুনের স্কুল থেকে ছাড়িয়ে এনে দিল্লির দুটি প্রখ্যাত স্কুলে ভর্তি করা হয়েছিল।

সন্ত্রাসবাদীদের খতম অভিযান এখন কড়া নিরাপত্তার জন্যে আপাতত বন্ধ থাকলেও তারা বেশ সক্রিয়। পাকিস্তান থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এবং অত্যাধুনিক মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র সহ বেশ কিছু সন্ত্রাসবাদী ভারতে প্রবেশ করতে গিয়ে সম্প্রতি ধরা পড়েছে।

সম্ভবতঃ এই সব কারণেই সিকিউরিটির লোকেরা আর ঝুঁকি নিতে চায়না। ইন্দিরা গান্ধীকে তাঁর নিজের বাড়ির ভিতরেই রক্ষা করতে অক্ষম হওয়ায় তাদের বেশ কঠোর সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে।

স্মরণ থাকতে পারে যে শ্রীমতী গান্ধীর হত্যার আগের দিন স্কুল থেকে ফেরার সময়ে রাহুল ও প্রিয়াঙ্কার গাড়িকে একটা ম্যাটাডোর ভ্যান এসে ধাক্কা মারে। সেটি ইচ্ছাকৃত না নিতান্তই দুর্ঘটনা তা এখনও জানা যায়নি। তাই ঠিক হয়েছে কেবল ফাইনাল পরীক্ষার সময় তারা স্কুলে যাবে এবং কড়া নিরাপত্তার মধ্যে তাদের পরীক্ষা দিতে দেওয়া হবে।

প্রধান মন্ত্রীর নতুন বাড়ি

প্রধানমন্ত্রী শীঘ্রই রেস কোর্স রোডে তাঁর জন্যে নতুন করে সাজানো বাড়িতে উঠে যাচ্ছেন। রেস কোর্স রোডের যে বাড়ি দুটিকে প্রধানমন্ত্রীর থাকবার জন্য ঢেলে সাজানো হয়েছে আগে সেদুটির একটিতে থাকতেন শিবশংকর এবং অন্যটিতে প্রাক্তন মন্ত্রী ও কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারী দলবীর সিং।

নিরাপত্তার দিকে দৃষ্টি রেখে বাড়িটিতে সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বাড়িটির চার ধারে থাকছে দুটি দেওয়ালওয়ালা কম্পাউন্ড ওয়াল। বোমার আঘাতে যাতে ক্ষতি না হয় সে ব্যবস্থাও এতে করা হয়েছে। নিকটে একটি পাওয়ার হাউস থাকা সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রীর বাড়ির জন্যে বিশেষ একটি পাওয়ার হাউসও তৈরি হচ্ছে। বাড়িটিকে ঢেলে সাজাতে খরচ পড়ছে প্রায় ২৫ লাখ টাকার মত!

আরও জানা গেছে যে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য প্রধানমন্ত্রীর আশেপাশের বাংলোগুলি তাঁর ঘনিষ্ঠ সহচর এবং উপদেষ্টাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

তবে প্রধানমন্ত্রীর জন্য একটা পাকাপাকি স্থায়ী বাড়ি সম্ভবতঃ তৈরি করা হবে প্রেসিডেন্ট বডিগার্ড প্যারেড গ্রাউন্ডের কাছের বিশাল এলাকাতে। নতুন বাড়িটির মডেল তৈরি করবার জন্য নাকি দিল্লির প্রখ্যাত ও অভিজ্ঞ ৬টি সংস্থাকে ইতিমধ্যেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর নিজস্ব আবাস গৃহ ছাড়াও সেখানে থাকবে তাঁর অফিস, একজন ডাক্তারের বাড়ি, প্রধান মন্ত্রীর ব্যক্তিগত কর্মীদের অফিস।

তবে সমস্ত ব্যাপারটি এখন ভীষণ ভাবেই গোপনীয় রাখা হয়েছে।

মন্ত্রী ভজনা করে বায়ুদূতের জেনারেল ম্যানেজার বিপদমুক্ত হতে চাইছেন

কেন্দ্রীয় বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রক দিল্লির প্রায় পরিত্যক্ত সফদরজং বিমানবন্দরটি বেশ কয়েক কোটি টাকা খরচ করে ঢেলে সাজাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। উল্লেযোগ্য ব্যাপারটা হল যে আশেপাশে অনেক উঁচু উঁচু বাড়ি গজিয়ে উঠেছে নিরাপত্তার প্রশ্নে এই বিমান বন্দরটি কমার্শিয়াল সার্ভিসের জন্য অনেকদিন থেকেই ব্যবহার করা হচ্ছে না।

বায়ুদূত সার্ভিসের দুটি বিশেষ ফ্লাইট যাতে সফদরজং বিমানবন্দর থেকে যাতায়াত করতে পারে তার জন্যেই নাকি এই ব্যবস্থা। এই দুটি ফ্লাইটের একটি যাবে রায়বেরিলী এবং অন্যটি যোধপুর ছুঁয়ে যাতায়াত করবে।

বায়ুদূতের বর্তমান ৫টি সার্ভিসই পালাম বিমান বন্দর থেকেই চালু রয়েছে। কেবলমাত্র দুটি বিশেষ ফ্লাইটের জন্য পালাম বিমান বন্দর ছেড়ে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে সফদরজং-এর ভোল পাল্টাবার প্রচেষ্টার প্রকৃত কারণটা কি?

জানা গেছে বায়ুদূতের জেনারেল ম্যানেজার হর্ষবর্ধন নিজেই এই প্রস্তাবটি দিয়েছেন পর্যটন মন্ত্রী অশোক গেলট এবং বিদ্যুৎ মন্ত্রী অরুণ নেহরুকে খুশী করবার

-- তন্তশ্রী--

-- বাংলার সেরা তাঁতের কাপড়।

বাংলার তাঁতশিল্পের নক্সায়, বুণনে, বৈচিত্র্যে ও শিল্পরুচিতে যুগান্তর সৃষ্টিকারী নাম --

তন্তুশ্রী

আপনার রুচিরই অন্য নাম "তন্তশ্রী"

বিক্রয়কেন্দ্র ঃ

কলিকাত, ত্রিপুরা (আগরতলা), নিউ দিল্লী, মাদ্রাজ, সিন্দ্রি (বিহার) ও পশ্চিমবঙ্গের অন্যত্র।

নিকটতম বিক্রয়কেন্দ্র ঃ

বালীগঞ্জ, বেহালা, বড়িষা, এম. এ. এল, হোস্টেল, শিয়ালদহ, শ্যামবাজার, নাগেরবাজার, সল্টলেক (বি, ডি, মার্কেট)

ওয়েস্ট বেঙ্গল হ্যান্ডলুম এন্ড পাওয়ারলুম ডেভ্লপমেন্ট কর্পোরেশন লিঃ

(রাজ্য সরকারের সংস্থা)

৬-এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার (৭ম তল) কলিকাতা-১৩

মার্কেটিং বিভাগ ঃ ১এ, অভয়গুহ রোড, কলিকাতা-৬

জন্য। কেননা এই 'ফ্লাইট দুটি অরুণ নেহরুর নির্বাচনী কেন্দ্র রায়বেরিলী এবং পর্যটন মন্ত্রী অশোক গেলটের নির্বাচনী কেন্দ্র যোধপুর ছুঁয়ে যাতায়াত করবে।

অরুণ নেহরু ক্ষমতার শীর্ষে ওঠ:বার সংগে সংগেই বায়ুদূতের জেনারেল ম্যানেজার হর্ষবর্ধন তড়িঘড়ি বায়ুদূতের দিল্লি–রায়বেরিলী–লক্ষ্ণৌ–দেরাদুন —— সার্ভিস চালু করে দিয়েছেন তাঁর মন পাবার জন্যে।

আরো জানা গেছে যে সফদরজং বন্দর থেকে এই দুটি বিশেষ ফ্লাইট চালু করবার ব্যাপারে বিমান পরিবহন দপ্তর প্রথমে রাজী হন নি। কিন্তু হর্ষবর্ধন সাহেব কায়দা করে শেষ পর্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাদের রাজী করেছেন। এখন সিকিউরিটি ক্লীয়ারেন্স পেলেই পুরোদমে কাজ সুরু হয়ে যাবার কথা।

স্বভাবতই প্রশ্ন উঠবে হর্ষবর্ধন তড়িঘড়ি এই সিদ্ধান্ত নিলেন কেন এবং বিমান পরিবহন মন্ত্রককে রাজী করাতে আদা জল খেয়ে লেগেছিলেন কেন।

অভিজ্ঞ মহলের খবর যে হর্ষবর্ধনের সংগে বোম্বাই চিত্র জগতের এক নামকরা অভিনেত্রীর নাকি খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তাতে অবশ্য দোষের কিছু থাকা উচিত নয়ও। কিন্তু মহামান্য হর্ষবর্ধন সাহেব সমস্ত কিছু আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে সেই চিত্রাভিনেত্রীর বিদেশ ভ্রমণকালে অন্যায় ভাবে নিজ ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করে নানান আর্থিক সুযোগ সুবিধা করে দিয়েছিলেন বলে তাঁর বিরুদ্ধে এখন সি বি আই এনকোয়ারি হচ্ছে। তাই তিনি উঠে পড়ে লেগেছেন যদি দুই মন্ত্রীকে খুশী করে বিপদ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। তবে অভিজ্ঞ মহলের ধারণা যে হর্ষবর্ধন শেষ রক্ষা করতে পারবেন না। কারণ এ-অরুণ এখন আর সে-অরুণ নেই। □

কেন্দ্রীয় সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন নিয়মাবলীর (১৯৫৬) ৮ ধারা অনুযায়ী গত ২ মার্চ ১৯৮৫ সংখ্যায় যে ফর্ম ৪ প্রকাশ হয়েছিল তার ক্রমিক সংখ্যা ৬ হবে –

(ক) মালিক ঃ বনফুল প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড,৩২, গণেশ চন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা – ৭০০০১৩

(খ) মোট মূলধনের একশতাংশেরও অধিক শেয়ার গ্রহীতা ঃ শ্রী চিরন্তন মুখোপাধ্যায়, পি–১৯৫, 'বি' ব্লক, লেক টাউন, কলিকাতা – ৭০০০৮৯ এবং শ্রী অরুণাংশু ঘোষ, এ ডি – ২৮, সল্ট লেক সেক্টর – ১ কলিকাতা – ৭০০০৬৪

চিরন্তন মুখোপাধ্যায়
প্রকাশক।

রাজনীতির নেপথ্যে

গোবর্ধন মিত্র

প্রণববাবু এখন আর কপার গেস্ট হাউসে উঠছেন না। তাঁর নতুন নিবাস নিজাম প্যালেস। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে বাদ পড়বার 'পর অধ্যাপক হুমায়ুন কবির যে কামরাটি দখল করতেন। ঠিক সেই কক্ষ। তবে কবির সাহেবের মত প্রণববাবু একাকী যাতায়াত করেন না। তাঁর পাশের কামরাটিও চাই। সেখানে থাকেন অনুগামীরা।

ইতিমধ্যে নিজাম প্যালেস অর্থাৎ সেনট্রাল গভর্ণমেন্ট হসটেলের সুরৎ পালটে গেছে। এলাকাটিতে একটি বহুতল অট্টালিকা উঠেছে। দোতলা ছোট গেস্ট হাউসের উপর তোলা হয়েছে আরও দুটি তলা। ভিড় অনেক বেশি।

অনেক কাজের ভিড়ের মধ্যেও প্রণববাবু এবার ভরত মহারাজ এবং বালক ব্রহ্মচারীর সংগে সাক্ষাৎ করেন। জানা গেল, দুজনেই তাঁকে আশীর্বাদ করেছেন। এসব ব্যাপারে যেমন ঢাকঢোল পেটান না, সেই রকম গোপন রাখতে চেষ্টাও করেন না। বললেন, বালক ব্রহ্মচারীর কাছে যাচ্ছি অনেক দিন। অজয় দা (মুখার্জি) পরিচয় করিয়ে দেন।

তিনটি উপনির্বাচন মাথার উপরে। দলনেতাদের ঘুম মাথায় উঠেছে। কংগ্রেসের অশোক সেন এবং প্রণব মুখার্জি চরকির মত ঘুরছেন। দুজনকে এক সংগে কোথায়ও দেখা যায় নি।

বরকত সাহেবকে কিন্তু কংগ্রেস এ রাজ্যে নির্বাচনী প্রচারে পায় নি। এক দিনের জন্য কলকাতায় এসেছিলেন। এয়ার পোর্ট থেকে নিজের ফ্ল্যাট। তারপর ভাই-এর রোলস রয়েসে সোজা মালদা। বরকত সাহেবকে এখন আর ট্রেনে যাতায়াত করতে দেখাই যায় না। কিন্তু ট্রেনে আলাপ জমে উঠলেই দেখা যাবে, বরকত সাহেব ঠিক এসে গেছেনই।

*

অশোক সেনের অন্য একটি পরিচয় হল তিনি ভোজন রসিক। সারা দিন কঠোর পরিশ্রম করতে ক্লান্তি নেই। কিন্তু আহারটি মনোমত হওয়া চাই।

আজকাল অবশ্য সামান্যই খান। ভাত বা রুটি নয়। মাছের একটা রোল, পাকা পেপে অথবা অন্য কিছু ফল আর কিছু মিষ্টি। আহার শেষ বড় পানতুয়া দিয়ে। অন্ততপক্ষে দুটো পানতুয়া চাইই। একা নয়, নির্বাচিত সহকর্মীর সংগে ডাইনিং টেবিলে বসা এবং খেতেখেতে গল্প করাটা ওঁর স্বভাব।

বহরমপুরে ওঁর আহারের মেনুর কিছু রকমফের হয়। ছয় ডজন বগড়ি রোস্ট করা হয়েছিল ওঁদের জন্য। সেইসংগে ছিল মুর্শিদাবাদি রসমালাই। নবাবি আমলের রুপোর রেকাবিতে সারভ্ করা হয়।

*

উপনির্বাচনী আসরে সোমেন সুব্রতকেও দেখা যাচ্ছে না। ইনটাক সম্মেলনের পর সুব্রত সম্ভবত ক্লান্ত। সোমেন বড়তলায় একটি সভায় ভাষণ দেবার পরই হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। দক্ষিণ কলকাতার একটি নারসিং হোমে ঠাঁই নিয়েছিলেন। এখন উড়িষ্যায়।

নুরুল ইসলাম গেছেন বিহারে। সেখানে নির্বাচনী প্রচারে নেমে পড়েছেন। তরুণ নেতাদের মধ্যে একমাত্র প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী-ই সমস্ত নির্বাচনী প্রচারে অংশগ্রহণ করছেন। □

অনুপ্রবেশ ঃ সীমান্ত জেলা মুর্শিদাবাদে নতুন সংকট

অসীমকুমার নাথ

৫৩৪১ বর্গমাইল জুড়ে ছড়িয়ে থাকা মুর্শিদাবাদ জেলার একটা বড় অংশ সীমান্ত এলাকা। চারটে মহকুমার মধ্যে জেলার তিনটে মহকুমাতেই আছে সীমান্ত গ্রামগুলো। তার মধ্যে লালগোলা তো প্রায় সারা দেশেই পরিচিত 'লালগোলা প্যাসেঞ্জার' নামক শিয়ালদহ সেকশনের একটা প্রায় প্রাগৈতিহাসিক ট্রেনের পরিচিতি থেকে। এ ছাড়া সীমান্ত এলাকাগুলো হলঃ ভগবানগোলা, জলঙ্গি, বামনাবাদ, রাণীনগর, সাগরপাড়া, কাঁটাবাড়ি, ঘোড়ামারা, ধুলিয়ান, অরঙ্গাবাদ, নির্মতিতা। আর আছে বহু চর এলাকা। এক সময় মুর্শিদাবাদকে বলা হত–চোর-চোট্টা-বদমাশ, তিন নিয়ে মুর্শিদাবাদ। এখন সে প্রবাদ বদলে গেছে। হয়েছে অনুপ্রবেশ ও চোরাচালানের পীঠস্থান মুর্শিদাবাদ।

অনুপ্রবেশ ঃ সরকারি পরিসংখ্যান

একাশি সালের জনগণনার প্রাথমিক হিসাবে মুর্শিদাবাদের জনসংখ্যা ৩৬ লাখ ৯৭ হাজার ৫৫২। ঠিক দশ বছর আগে একাত্তর সালে এই সংখ্যা ছিল ২৯ লাখ ৪০ হাজার ২৪০। অর্থাৎ দশ বছরে লোক বেড়েছে ৭ লাখ ৫৭ হাজার ৩১২। আর দশ বছরে সীমান্ত এলাকাগুলোয় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ঃ লালগোলা–১,২০,৩৪৬ (১৯৭১) ও ১,৭৩,৪৬১ (১৯৮১), ভগবানগোলা–১,৪৮,৬৬১ (১৯৭১) ও ১,৯০,৭৬৬(১৯৮১), ধুলিয়ানা–১,২৩,৫১৯(১৯৭১) ও ১,৮৩,৭৯৬ (১৯৮১), জলঙ্গি–৯৩,৮৬৭ (১৯৭১) ও ১,৩৪,৫৭৩ (১৯৮১), রাণীনগর–১,৫৫,৪৫৮ (১৯৭১) ও ২,০০,৬৯৩ (১৯৮১)। পঁচাশি সালে এই সংখ্যা আরও বেড়েছে। এর সবগুলোই কৃষি-প্রধান এলাকা। শিল্প এলাকায় কর্মসংস্থানের আশায় বাইরের বহু মানুষ ভীড় করে বলে সেখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া স্বাভাবিক। লালগোলায় দশ বছরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৫৩ হাজার ১১৫। এই ৪৪ শতাংশ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কি কৃষি-প্রধান লালগোলার পক্ষে স্বাভাবিক ? ধুলিয়ানে মানুষ বেড়েছে আরও। দশ বছরে বেড়েছে ৬০ হাজার ২৭৭–৫৬ শতাংশ। যেখানে ভারতবর্ষের মোট জনসংখ্যা স্বাধীনতার ৩৭ বছর পর মাত্র ৪০ শতাংশ হারে বেড়ে ৭০ কোটিতে দাঁড়ায় সেখানে দশ বছরে লালগোলায় ৪৪ এবং ধুলিয়ানে ৫৬ শতাংশ জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্রমাণিত করে এসব জায়গায় ব্যাপকহারে অনুপ্রবেশ ঘটছে।

কীভাবে অনুপ্রবেশ

যে রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা, লোভ, হিন্দু রাজনীতি এবং পূর্ব বাংলায় দীর্ঘসময় হিন্দু জমিদার কর্তৃক মুসলমান প্রজা নিপীড়নের ফল দেশ ভাগ তারই অত্যন্ত স্বাভাবিক ফলশ্রুতি হল আজকের অনুপ্রবেশ। দু'মুঠো খাবারের জন্য রাজনৈতিক সীমান্তকে স্বীকৃতি জানাতে ব্যর্থ হয় গরীব মানুষের জঠর, আর শিক্ষা ও সততার দুর্ভিক্ষময় বিশাল এই এশিয়াটিক ভূখন্ডে তাঁরাই হয়ে ওঠে বার বার মন্দির আর মসজির কর্ণধারদের নোংরা রাজনীতির খাদ্য।

আমাদের প্রতিবেশী দেশে কোন ধরণের অস্থিরতা বা উত্তেজনা দেখা দিলে বহু মানুষ এ দেশে আশ্রয় নেয়। আত্মীয়হীন এবং অনেক সময় নিঃস্ব মানুষরা হয়ে যায় উদ্বাস্তু বা শরণার্থী। কালক্রমে দেশীয়দের স্রোতে মিশে জনগণনার সংখ্যাতত্ত্বকে স্ফীত করে। কোনও রকম অস্থিরতা বা রাজনৈতিক উত্তেজনা ছাড়াই প্রতিবেশী দেশ থেকে বহু মানুষ এ দেশে ঢুকে পড়ে। এরাই পাকাপাকি ঠিকানা করে ফেলছে মুর্শিদাবাদের এইসব সীমান্ত এলাকা-গুলোয়। বাকীরা জীবিকার সন্ধানে ছ'সাত মাসের পাততাড়ি পাতে। অনুপ্রবেশকারীরা এ দেশে স্থায়ী ঠিকানা তৈরি করে নানান কায়দায়। যেমন লালগোলায় থাকেন এমন কোন পরিবারের আত্মীয় নিজের দেশ ছেড়ে 'বেড়াতে' এলেন বৈধ কাগজপত্র ছাড়াই। সীমান্ত রক্ষীদের 'কড়া নজর' কী করে এড়ানো হয় সে কাহিনীতে পরে আসছি। এর পরে এ দেশীয় আত্মীয়ের সহযোগিতায় জমি-টমি কিনে 'ছিটে-বেড়ার' কোন অস্থায়ী ঘর বানায়। তারপর একদিন স্বদেশে প্রত্যাবর্তন এবং অচিরেই পরিবারের অন্যান্যদের নিয়ে আগমন। স্থানীয় প্রধান বা রাজনৈতিক নেতাকে ধরে অচিরেই রেশন কার্ড তৈরি এবং এভাবে ভারতীয় নাগরিকত্ব অর্জন। জলঙ্গি থানার কাঁটাবাড়িতে গিয়ে আরেকটা পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হলাম। মূল পদ্মা এবং পদ্মার শাখা নদী যা এদেশে 'পদ্মার ছাড়' নামে খ্যাত তার বিস্তীর্ণ চর ভেঙে ক্ষেত মজুর (স্থানীয় নাম মুনিশ) খাটার আশায় এ ধরনের মানুষরা কাঁটাবাড়ি, বামনাবাদ, চর মুন্সিপাড়া, চর রাজাপুর, জয়পুর, ডোবাপাড়া ইত্যাদি অঞ্চলের জমির মালিকের কাছে ধর্ণা দেয়। এ ধরনের মজুর অল্প মূল্যে পাওয়া যায় বলে এবং এরা মালিকের অত্যন্ত আজ্ঞাবহ হওয়ায় জমির মালিকই তাকে খাদ্য আর থাকার জায়গা দেয়। কয়েক মাস মজুর খাটার পর মালিকের কাছে মজুরটি এ দেশে পাকাপাকিভাবে থাকবার অনুরোধ জানায়। মালিক তখন তাকে কম দামে আস্তানা বানাবার জন্য জমি বিক্রি করে। কাঁটাবাড়ির সাতভাই-পাড়া কলোনির বেশ কিছু মানুষ এ ধরনের ক্ষেত মজুর। সংখ্যায় নগন্য হলেও আরও এক ধরনের পদ্ধতি হল এ দেশীয় হিন্দু ও মুসলিম মেয়েকে বিয়ে করা। বছরের বেশি সময়টা এরা শ্বশুরের দেশে থাকে, মাঝে-মধ্যে নিজের দেশে যায়। সেখানেও হয়ত আরেকজন স্ত্রী থাকে। এদেরকে স্থানীয় ভাবে বলা হয় 'দোঘরে'। লালগোলার কয়েকজন হিন্দু মেয়ের সঙ্গে এভাবে 'দোঘরে'-দের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে। বিয়েটা কখনও জোরজবরদস্তি করে, কখনও স্বেচ্ছায় হয়। আবার দীর্ঘ কয়েক বছর আগে দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার পর নতুন করে এ দেশে ফিরে আসারও ঘটনা ঘটে। অবশ্য ক্ষুধাই এই অনুপ্রবেশের প্রধান কারণ।

কারা মদত দেয়

জেলার সীমান্ত গ্রামগুলোয় এভাবে অনুপ্রবেশ হয়। অর্থবান অনুপ্রবেশকারীরা জেলা শহর বহরমপুর বা রাজ্যের সর্বত্র এমন কি ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত বিশেষত নিজস্ব ধর্মাবলম্বী অধ্যুষিত প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি বা মৃত্যুর হার কমে যাওয়া তাই মুর্শিদাবাদের জন্যসংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান কারণ নয়। অনুপ্রবেশকারীদের মদত দেয় স্বধর্মের মানুষ এবং কমবেশি নানা রং-এর রাজনীতিকরা। এমন কি পঞ্চায়েত

প্রধান থেকে শুরু করে সংসদ সদস্য পর্যন্ত জনপ্রতিনিধিরাও পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য যোগান। যেমন কাঁটাবাড়ি বা ধুলিয়ানে পঞ্চায়েত প্রধান, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, বিধায়ক এবং সংসদ সদস্যদের ব্যক্তিগত ধর্ম এক। আর এরা প্রায় একই রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি। নির্দিষ্ট তথ্য দিয়ে এ সত্য প্রমাণ না করা গেলেও বোঝা যায় অনুপ্রবেশকারীদের এঁরা কীসের স্বার্থে রেশন কার্ড করিয়ে দেন। লালগোলার কোনও এক রেশন ডিলার (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক) খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের কাছে অভিযোগ করেছিলেন যে, তাঁর এলাকায় এমন বহু ভুয়া রেশন কার্ড আছে যাদের মালিকরা এ দেশীয় নয়। তাঁর এই অভিযোগে কোনও কাজ হয়নি। এখানে একটা উল্লেখ্য বিষয়–এধরণের প্রশ্রয়দান কিন্তু বহু বছর আগেই শুরু হয়েছে।

খুঁজে বের করা কি শক্ত

সরকারিভাবে মুর্শিদাবাদে এই ব্যাপকহারে অনুপ্রবেশ কখনই স্বীকার করা হয়নি। কিন্তু সামান্য অনুসন্ধানে এসব অনুপ্রবেশকারীদের খুঁজে বের করা যায়। এই প্রতিবেদকই লালগোলা, ধুলিয়ান, জলঙ্গি বা কাঁটাবাড়ি ঘুরে স্থানীয় মানুষের সাহায্যে কয়েকজন অনুপ্রবেশকারীর সঙ্গে কথা বলেছেন কাঁটাবাড়ির ঐ সাতভাইপাড়া কলোনিতে সম্প্রতি এমনি কয়েকজন অনুপ্রবেশকারী পাকাপাকি আস্তানা তৈরি করেছে। এদের মধ্যে একজন আবার এ দেশে চার-পাঁচটি ডাকাতির আসামী ছিল। বডি ওয়ারেন্ট থাকায় সে সীমান্ত পেরিয়ে পালায়। তারপর দীর্ঘ ১২ বছর পর মাস পাঁচেক আগে কাঁটাবাড়িতে ফিরেছে। এমনি অনুসন্ধানে জানা যায় লালগোলার ঝাউবোনায় চাঁই সম্প্রদায়ের মানুষদের সংখ্যা বছর দশেকের মধ্যে কী করে ৭৫ শতাংশ থেকে নেমে যায় ২৫ শতাংশে।

ঘাট মানে ঘাঁটি

একদিকে অনুপ্রবেশ অন্যদিকে চোরাচালান মুর্শিদাবাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থায় অস্থিরতা এনে দিচ্ছে। চোরাচালান তো অত্যন্ত উদ্বেগজনক স্তরে পৌঁছেছে। সীমান্ত গ্রামে চোরাচালান সারা বছর ধরেই চলে। বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন রকমের জিনিসপত্র বেচা-কেনা হয়। লালগোলার সীমান্ত পেরিয়ে আমাদের দেশে আসে পাট, গুঁড়ো দুধ, পুরোন পোশাক, ইলেকট্রনিকস্ দ্রব্য, বিদেশী মদ, সিগারেট, বর্ষায় ইলিশ মাছ এমন কি জাপানি মোটর সাইকেল। ধুলিয়ানে এসব ছাড়াও আসে ড্রাম-ড্রাম বিদেশি নারকেল তেল। জলঙ্গি এলাকার বিভিন্ন সীমান্ত পেরিয়ে আসে কাঁসার বাসন (স্থানীয় নাম ভাঙরী) এবং তামার তার। আর প্রত্যেকটা সীমান্ত দিয়েই আসে নানান ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র, কার্তুজ এবং রাসায়নিক সার। চাষের মরশুমে সার আসে বিপুল পরিমাণে। কাঁটাবাড়ির অবস্থাপন্ন এক চাষী জানালেন, গত বছর যখন দেশীয় সার বাজারে পাওয়া যাচ্ছিল না, তাঁর মত অনেকেই তখন হাতমার্কা ডি এ পি বিদেশি সার চাষের কাজে ব্যবহার করেছিলেন। বিদেশি বিক্রেতারাই নিজেই ক্রেতার বাড়িতে গিয়ে সার পৌঁছে দেয়। অন্যদিকে লালগোলার সীমান্ত পেরিয়ে আমাদের দেশ থেকে যায় সরষে, কেরোসিন তেল, কয়লা, মশলাপাতি, নুন, কাপড়(গামছা পর্যন্ত), মশারি, নাইলনের সুতো ও মাছ ধরার জাল এবং অপর্যাপ্ত সাইকেল পার্টস। ধুলিয়ান থেকে যায় বিশেষত তামাক বিড়ির পাতা ও মশলা। জলঙ্গি পেরিয়ে এসবই যায়। আর প্রত্যেকটা সীমান্ত পেরিয়ে যায় শ'য়ে শ'য়ে গরু এবং কুইন্ট্যাল-কুইন্ট্যাল চাল।

প্রতিবেশী দেশে চালের দাম সব সময়েই চড়া থাকে। ফলে এ দেশ থেকে বাঙালির প্রধান খাদ্য-দ্রব্য চাল সারা বছর ধরেই চলে যায়। মুর্শিদাবাদ জেলায় চাল উৎপাদন মোটামুটি সন্তোষজনক পর্যায়ের। তিন টাকা কিলো দরে চাল এখানে পাওয়া কোন শক্ত নয়। কিন্ত এভাবে চাল বিদেশে পাচার হয়ে যাওয়ায় মুর্শিদাবাদ তথা দেশের খাদ্য ভান্ডারে টান পড়ছে এবং জেলায় চালের দাম বেড়ে যাচ্ছে। চোরাই দ্রব্য কেনা-বেচার বাজার বা কেন্দ্রগুলো বিভিন্ন নামে পরিচিত। লালগোলায় এর নাম ঘাট। নামে ঘাট হলেও নদী বা পুকুর পাড় নয়। ঘাট মানে ঘাঁটি। ধুলিয়ানের নাম মন্ডি বা গোলা। জলঙ্গির কোথাও ঘাঁটি কোথাও হাট।

ঘাটগুলো কোথায়

লালগোলায় এমন সব ঘাটগুলো হ'ল–সায়েদপুর, বিলবোরা, কোপড়া, রামনগর, দেশোয়ালি পাড়া, গাবতলার পুরোন ঘাট, নতুনগ্রামের কালমেঘ, দিয়ার মানিক চক, আশারিয়া দহ, ভগবানপুর, তারানগর এবং দুর্লভপুর। ভগবানগোলায় হল–চর কুঠি বাড়ি, আখেরিগঞ্জ,বামনাবাদ, পোয়ালা-ডাঙা। ধুলিয়ান ও অরঙ্গাবাদ এলাকাও প্রকাশ্য ঘাট। জলঙ্গিতে ঘাটগুলো আছে বামনাবাদ, সাহেবনগর, সাগরপাড়া, ফরাজিপাড়া এবং বিভিন্ন চর এলাকায়। লালগোলায় রবিবার, ধুলিয়ানে শুক্রবার আর জলঙ্গি এলাকাতেও শুক্রবার হাটের দিন এ সব চোরাই দ্রব্য প্রকাশ্যে কেনা-বেচা হয়।

কারা যুক্ত

সাধারণত চোরাচালানে জড়িত থাকে বিদেশীরাই। এদের বয়স ৩৫ বছরের মধ্যে। পদ্মা এবং এদেশীয় পদ্মার ছাড় বর্ষায় এক হলে বড় বড় নৌকা এসে লাগে এসব ঘাঁটিগুলোয়। শীতকালে জলে নেমে গেলে বেশির ভাগ চোরাকারবারী যাতায়াত করে সাইকেলে। সীমান্ত পেরিয়ে এরা (স্থানীয় নাম ব্ল্যাকি) লুঙ্গি-জামা ছেড়ে প্যান্ট-শার্ট বা পাজামা-শার্ট পরে। জানুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে লালগোলা, ধুলিয়ান এবং জলঙ্গি ঘুরে কয়েকজন ব্ল্যাকিকে দেখলাম। এদের পোশাক দেখে সন্দেহ জাগে, তবে তা স্থানীয় মানুষদের চোখেই শুধু ধরা পড়ে। লালগোলায় আমার দুই সঙ্গী ছিলেন স্থানীয়। সাইকেল চেপে আসা এমন কয়েকজন ব্ল্যাকিকে তাঁরা চিনিয়ে দিলেন। দেখলাম পোশাকে এমন কিছু ধরা যায় না যে এরা বিদেশী। তবে পায়ের কেড্স চিনিয়ে দিচ্ছিল জিনিসটা বিদেশী। সাইকেলের পিছনের ক্যারিয়ারে বেশ বড়-সড় একটা বস্তা। সাইকেলের রবারের টিউব দিয়ে বাঁধা। আমরা গেলাম মূল সীমান্ত এলাকায়। পথের মধ্যে পড়ল রামনগর।

রামনগর হল মিনি মার্কেট। টালি বা টিনের ছাওনি আর খলপার দেওয়ালের সারি সারি ঘর। মাল এসে ঐ সব খুপরিতে প্রথম রাখা হয়। খুপরির ভাড়া দৈনিক ১৫ টাকা। ৪/৩ হাত আয়তনের খুপরির একটায় থাকে মালপত্র, লাগোয়া অন্যটিতে থাকে ব্ল্যাকি নিজে। রামনগর ঘাটের সামনেই পদ্মার ছাড় নামে পরিচিত নদী। তেমন জল নেই। চারদিকের জমিতে রবিশস্য লাগানো হয়েছে। নতুন লোক দেখে কয়েকজন আশপাশে এসে দাঁড়াল। এর আগে গিয়েছিলাম ধুলিয়ানে। গঙ্গার ভাঙনে ধুলিয়ানের অবস্থা সংকটজনক। গঙ্গার পাড়ে গিয়ে প্রথমেই চোখে পড়ে বিধ্বস্ত পাড়ের একেবারে উপরে দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি খুপরি। যা ব্যবহৃত হয় বেচাকেনার ঘাঁটি হিসাবে। এর নীচে সমুদ্রের মত নীল জলরাশি নিয়ে কলকল শব্দে বয়ে চলেছে গঙ্গা। লালগোলা বা ধুলিয়ানে হাটবারে যাইনি বলে ব্ল্যাকিদের বেশি দেখিনি। কিন্তু জলঙ্গির বামনাবাদে দেখলাম বহু। এদের বেশি অংশ যুবক। বামনাবাদ হাইস্কুলের কিছুটা আগে এক বটতলায় দেখলাম চার-পাঁচ ব্যক্তি দাঁড়িয়ে কথা-বার্তা বলছে। পরে জানলাম ওদের দু'জন সাধারণ পোশাকের পুলিস কর্মী। তখনই দেখি রাস্তা দিয়ে মুখ বাঁধা বস্তা নিয়ে

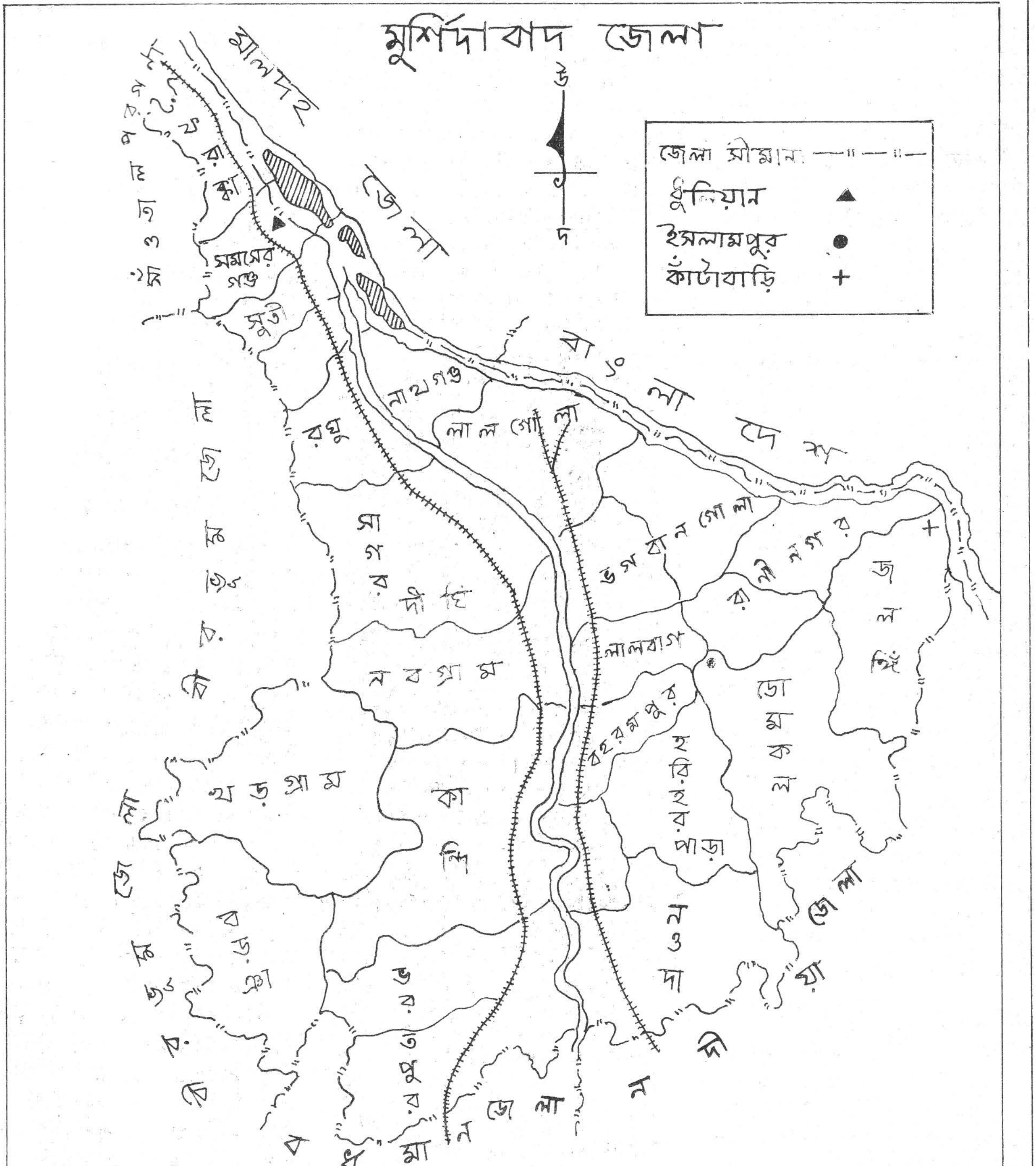
মুর্শিদাবাদ জেলা
উ
দ
জেলা সীমানা
ধুলিয়ান
ইসলামপুর
কাঁটাবাড়ি
মালদহ
জেলা
বাংলা দেশ
সাঁওতাল পরগণা
ফরাক্কা
সামসের গঞ্জ
সুতী
নাথগঞ্জ
রঘু
লালগোলা
সাগরদীঘি
ভগবানগোলা
রানীনগর
জলঙ্গি
লালবাগ
নবগ্রাম
বহরমপুর
ডোমকল
খড়গ্রাম
কান্দি
হরিহরপাড়া
বড়ঞা
ভরতপুর
নওদা
নদীয়া জেলা
বর্ধমান জেলা
বীরভূম জেলা

আরেক ব্ল্যাকি সাইকেলে নদীর দিকে যাচ্ছে।

আর্থিক-সামাজিক ব্যবস্থায় আঘাত

মুর্শিদাবাদের আর্থিক এবং সামাজিক ব্যবস্থায় এই চোরাচালান যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছে। ধুলিয়ানের এক শিক্ষক বললেন, কাঁচা পয়সা হাতে আসায় যুবকরা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে যাচ্ছে, জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাচ্ছে। সামাজিক ব্যবস্থাতেও আঘাত পড়ছে। চোরাচালানকারীদের স্ফূর্তির উপকরণ যোগাতে সমাজের মেয়েদের প্রলোভিত করা হচ্ছে। রাণীনগর থানার চক ইসলামপুর সীমান্ত এলাকা না হলেও চোরাকারবারী-দের এটিও একটি ঘাঁটি। এখানে চোরাকারবারীদের বলা হয় এল পি। প্রধানত বিদেশি লেডিস প্যান্ট বিক্রি করে বলে এদের এল পি বলে। চক ইসলামপুর মুর্শিদাবাদের বিখ্যাত রেশম শিল্পের প্রধান কেন্দ্র। এখানের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা এল পি-দের অত্যাচারে কলুষিত হচ্ছে। লালগোলার মিনি মার্কেটের মত এখানেও সারি দেওয়া খুপরিতে দিনে চলে মাল কেনা-বেচা, রাত্রে দেহ-ব্যবসা। বাইরের বহু মেয়ে 'ব্যবসা' করতে এখানে আসে এবং রাত্রিবাস করে। পুরুষ ব্যবসায়ীরা তাদের রাত্রে ব্যবহার করে আদিমতম ব্যবসায়। সন্ধ্যার পর এলাকার স্থানীয় মহিলারা ইসলামপুর বাজার বা বাস স্ট্যান্ড এলাকায় ভয়ে বেরোয় না। এলাকার বিধায়ক হলেন ফরওয়ার্ড ব্লকের ছায়া ঘোষ। তিনি অনেক চেষ্টা করেও এ জিনিস বন্ধ করতে পারেননি। এমন কি পরোক্ষে এসবের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে কয়েকজনকে দল থেকে তাড়িয়েও দেওয়া হয়। কিন্তু চোরাকারবারীদের চক্র এত বড় এবং শক্তিশালী যে ছায়া ঘোষ এসব বন্ধ করতে পারেননি। স্থানীয় মানুষরা অভিযোগ করলেন চোরাকারবার বন্ধ না হলে চক ইসলামপুর থেকে অচিরেই রেশম শিল্প নষ্ট হয়ে যাবে।

জাল কীভাবে বিস্তৃত

বি এস এফ-এর 'কড়া নজর' এড়িয়ে কী করে পাচারকারীরা সীমান্ত পেরোয় তা ভাবা ধাঁধার মত মনে হলেও বিস্ময়ের কোন ব্যাপার নয়। লালবাগের কাছে রৌশনবাগের বি এস এফ-এর ৮৭ নম্বর ব্যাটেলিয়নের কর্তৃপক্ষ মাঝে মধ্যে সাংবাদিকদের ডেকে জানান মুর্শিদাবাদের সীমান্তের সর্বত্র নজর রাখা তাদের পক্ষে অসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। সীমান্তের অধিকাংশ নদী, বিল বা পদ্মা। এই ব্যাটেলিয়নের স্পিড বোট, নজরদারী লঞ্চের যে সংখ্যা তাতে সব এলাকায় সব সময় নজর রাখা সম্ভব না। কিন্তু লালগোলায় যে রামনগর ঘাটের কথা আগে বলেছি তার ঠিক প্রায় পাশেই আছে বি এস

এফ-এর একটা চৌকি। ঘুরতে ঘুরতে আমরা সেখানে গিয়ে দেখলামও উঁচু পর্যবেক্ষণ টাওয়ারে দাঁড়িয়ে একজন জওয়ান চোখে দূরবীন লাগিয়ে সীমান্তের দিকে তাকিয়ে আছেন। অথচ চৌকির বামদিকের রাস্তা দিয়ে দুপুর বেলায় চোরাকারবারীরা যাতায়াত করছে। অবশ্য মাঝে-মধ্যে বি এস এফ হানা দিয়ে প্রচুর চোরাই মাল আটক করে। তারপর সেটা নিলামে তোলা হয়। বাজার মূল্যের ৩৩ শতাংশ দাম উঠলেই বি এস এফ সার্টিফিকেট দিয়ে সে মাল বিক্রি করে দেয়। কিন্তু নিলাম হবার সময় তার ধারে কাছে সাধারণ মানুষ বা ক্রেতা ঘেঁষতে পারে না। যাদের মাল তারা বা তাদের মদতদাররাই শুধু ডাকের সময় সেখানে থাকে। সম্প্রতি আটক একটা জাপানি মোটর-বাইক নিলামে বিক্রি হয়েছে মাত্র দেড়হাজার টাকায়। কারণ এর বেশি দাম আর ওঠে নি। হল্যান্ডে তৈরি নামী কোম্পানির একটা রেডিও বিক্রি হয়েছে মাত্র তিনশো টাকায়। যার বাজার মূল্য কমপক্ষে তিন হাজার টাকা। নিলাম থেকে ছাড়পত্র সংগ্রহ করে এসব চোরাই মাল চলে আসে কলকাতা বা অন্যত্র। বি এস এফ এ ছাড়াও কাজ করে, সাগরপাড়া থেকে পাবলিক বাসে ফেরবার সময় দেখলাম রাণীনগরের আগে বি এস এফ বাস পরীক্ষা করল। রাণীনগরের কাছে গোধন পাড়ার হাটে তিরাশির শেষের দিকে চোরাই মাল আটক করা নিয়ে বি এস এফ-এর সঙ্গে চোরাকারবারীদের সংঘর্ষ বাধে। বি এস এফ সংযত আচরণ করলেও রাণীনগর থানার পুলিস এসে এলোপাথাড়ি গুলি চালায়। দোষীদের না পেয়ে পুলিস ঘটনাস্থল থেকে দূরে মাঠে কর্মরত একজন চাষীকে মেরে ফেলে। আর শুল্ক বিভাগের নাকের ডগায় অর্থাৎ বহরমপুর শহরের বিভিন্ন ইলেকট্রনিক্স দ্রব্যের দোকানে বিক্রি হচ্ছে বিদেশী রেডিও, ঘড়ি, টেপ-রেকর্ডার, ক্যালকুলেটার এমন কি ব্যাটারিচালিত পোর্টেবল টি ভি সেট।

ধর্মের নামে

এসব ছাড়াও মুর্শিদাবাদে মাঝে মধ্যেই সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় উত্তেজিত হয়ে ওঠে। এক শ্রেণীর ধর্মান্ধ মানুষের সাম্প্রদায়িক সুড়সুড়িতে এক দল বিভিন্নভাবে অন্যজনের উপর অত্যাচার করে। কখনও চর এলাকা দখলের জন্য, কখনও চোরাচালান অবাধ করতে আবার কখনও বা গ্রামকে গ্রাম দখল করার জন্য 'ধর্ম-বিপন্ন' হুজুগ তুলে হাঙ্গামা বাধানো হয়। চর এলাকা দখল করার উদ্দেশ্যে এমনি একটা মারাত্মক ঘটনা ঘটে আশি সালের ৪ অক্টোবর। ধুলিয়ানের কাছে পারশিবপুর চরে উদ্বাস্তুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে একদল ধর্মান্ধ সশস্ত্র মানুষ। অন্তত ৩০-৪০ জন উদ্বাস্তুকে সেবার মেরে কেটে পদ্মার জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তৎকালীন কংগ্রেসের দলনেতা বিধানসভায় এই অভিযোগ করেছিলেন। যদিও সরকারিভাবে মৃতের সংখ্যা স্বীকার করা হয়নি। বলা হয়েছিল সাত-আটজন মানুষ এই সংঘর্ষে নিহত হয়।

৮৩ সালে দুর্গা পুজোর সময় রাণীনগরের কাছাকাছি এক চরে চাঁই সম্প্রদায়ের মানুষের ঘরবাড়িতে আগুন লাগানো হয়। দৈবাৎ বৃষ্টি নেমে ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি বন্ধ করে। চক্ ইসলামপুরের '৮৩ সালের ১ জুন সরকারি জমির উপর ধর্মীয় প্রার্থনা স্থান তৈরি করা নিয়ে পুলিসের সঙ্গে ধর্মান্ধ মানুষের সংঘর্ষ বাধে। আদালতের রায়ে ঐ জমিতে কোন ধর্মীয় প্রার্থনা স্থানের ইমারৎ বানানো নিষিদ্ধ করা হয়। প্রশাসন সংগঠকদের আগাম নোটিশ দিলেও ঐ জমিতে পাকা দেওয়াল তোলা বন্ধ হয় না। আদালতের রায় কার্যকরী করতে গিয়ে পুলিস বাধা পায়। 'ধর্ম বিপন্ন' জিগির তুলে নিমেষে সশস্ত্র বহু ধর্মান্ধ মানুষ জমায়েত হয়ে পুলিসকে আক্রমণ করে। আত্মরক্ষার্থে পুলিস গুলি চালাতে বাধ্য হয়। পাঁচ-ছ'জন মানুষ মারা পড়েন। আর সরকারি নির্দেশ বা আদালতের রায় পালন করতে গিয়ে তৎকালীন জেলা শাসক প্রদীপ ভট্টাচার্যকে 'সাম্প্রদায়িক প্রশাসক' বদনাম মাথায় নিয়ে জেলা ছেড়ে যেতে বাধ্য করা হয়। বামনাবাদে ঘটেছিল এর থেকেও ন্যক্কারজনক ঘটনা। এখানে বাঙালির প্রধান জাতীয় উৎসব পালনেও বাধা আসে। এর প্রতিবাদ করতে গিয়ে কাঁটাবাড়ির শিক্ষক জগদীশ সাহা '৮৪ সালের অকটোবর মাসে নৃশংসভাবে খুন হন। মুসলিম বাউল শিল্পীদের উপরেও অত্যাচার হয়। তাঁদের অপরাধ তাঁরা বিধর্মীদের গান করে। প্রশাসন যে সব সময় দূরদর্শিতার পরিচয় দেন এমন নয়। বামনাবাদে '৮৪ সালে দুর্গা প্রতিমা নিরঞ্জনে প্রশাসন বাধা দেয় সেখানকার এক সম্প্রদায়ের আবেদনের ভিত্তিতে। প্রশাসনের এই বাধা দান যে আইন মাফিক নয় এ কথা কলকাতা হাইকোর্ট পরিষ্কার করে জানিয়ে দেয়। বিগত বছরের ১৮ ডিসেম্বর হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি ভগবতীপ্রসাদ ব্যানার্জি তাঁর রায়ে প্রশাসনের এই বাধাদানের প্রচন্ড সমালোচনা করেন। □

সংবাদ-সাহিত্য

'শেষ নমস্কার'

কেহ প্রশ্ন করিলে মুশকিলে পড়িব। টেলেক্স, স্যাটেলাইট অথবা অতি-বিজ্ঞান-উদ্ভূত কোনও পন্হায় এই ডায়েরির অংশ পাইয়াছি। রহস্যটা কী তাহা স্বয়ং ব্যোমকেশ বকসীও ভেদ করিতে পারিবেন না। সন্তোষকুমার ঘোষের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই ইহা আমাদের হস্তগত হইয়াছে। কে পাঠাইয়াছেন, কেন পাঠাইয়াছেন রসিক পাঠক তাহা বুঝিয়া লইবেন। এ ব্যাপারে আমরা মাথা ঘামাইতে চাহি না। সন্তোষকুমার ঘোষের দিনলিপির মুদ্রিত কিছু অংশ ছাড়াও এখানে আছে অপ্রকাশিত অনেকখানি (মৃত্যুর পরেও যাহা লেখা চলিতেছে) -- সঙ্গে আছে নূতন কিছু সংবাদ।

দিনলিপি... চিত হয়ে অনেকদিন তো শুয়ে রইলাম, এবার গিয়ে চিতায় উঠব। ইচ্ছে আছে বুক চিতিয়ে সোজা হেঁটেই যাব কিন্তু বিধির বিধান কাটব এমন শক্তিমান কি আমি? তার চেয়ে চিতেন গেয়ে শেষ নমস্কার জানানোই ভাল।

আগে লিখেছিলাম নভেম্বরের সাত তারিখে 'আমার বুকের মধ্যে যে গায়ক, সে নিঃশব্দে গাইতে থাকল' কিন্তু ২৬/২/৮৪ সে গায়ক কোথা যে উধাও হল কে জানে! ভিন্নরুচিতে 'যেথা গান থেমে যায়, দীপ নেভে হায়' -- দ্যুৎ এটা কি! না, না, ঠাকুরের গান নয় তবু লিখেছে ভাল, একদম নির্ভেজাল আমার একটা মুভি ছবি যেন!

সমুদ্রকে দেখে কবে যেন আমার জন্মান্তরে বিশ্বাস জন্মেছিল -- মনে হয় সে কত যুগ আগে! সমুদ্রের নীল কোথা? এখানে সমুদ্রই নেই। সেই নীলিমায় নীল, তোমাতে পেয়েছে তার অন্তরের মিল। বনরাজিনীলা!

নীলের একটা আশ্চর্য মাদকতা আছে। নীলনবঘনে আষাঢ় গগনে -- কবির সেই মেঘৈর্মেদুরম্বরম্ আষাঢ় কি আর পাব?

আমার ষাট বছরের বন্ধু সুনীল রয়ে গেল, চিঠি দেওয়া যাবে কী? তার ছেলেটি আমার শেষ জীবনের সঙ্গী, সবচেয়ে কাছের মানুষ ছিল। এখানে কান্না নেই, নইলে তার জন্যে আমার কর্কট হৃদয়ে ধারাপাতের সূত্রপাত হত।

১০/১১/৮৪ লিখেছিলাম: আমার ভোগান্তি অনেক বাকি। নরক-যন্ত্রণাটা বোধহয় ইহলোকেই সেরে যেতে হবে।

কিন্তু ইহলোকে পুরো কোটা শেষ হল না। বাকিটুকু -- যাবার সময় সেই কিনু গোয়ালার গলির চেয়েও নোংরা পথ, তারও পরে একটা জটিল পথ বেয়ে 'অন্ধকারে চুরাশিটি নরকের কুন্ড, তাহাতে ডুবায়ে ধরে পাতকীর মুন্ড' অতিক্রম করে যেতে হল। কোন পাপে তা বুঝলাম না।

স্বর্গলোকে আসামাত্রই রিসেপশন এবং মোস্ট কর্ডিয়াল রিসেপশন -- উর্বশীর নৃত্যসভা। সভাপতি উদয়শঙ্কর, প্রধান অতিথি সম্মানিত নবাগত আমি। মরমে মরে গেলাম, কারণ ডেইসে বসেই দেখলাম অডিটরিয়ামে ফ্রন্ট রোয়ে রবীন্দ্রনাথ। প্রসঙ্গটা পাশ কাটিয়ে যেতে চাই।

রবীন্দ্রনাথের গান আমাকে পাগল করে কিন্তু ওই মর্মভেদী দৃষ্টির সামনে বসে থাকা যায় না। এড়িয়ে যাবার উদ্দেশ্যে ইন্টারভ্যালে এদিক ওদিক করতে গিয়ে একেবারে উর্বশীর মেক-আপ রুমে।

উর্বশী মুচকি হাসলেন শুধু, আমাকে দেখে। দীর্ঘকাল প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীটে দিন গুজরান করেছি কিন্তু কোনও রমণীয় মুখে এমন কমনীয় হাসি তো দেখি নি। পানপাত্র শেষ হতেই উর্বশী আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে চললেন পরবর্তী 'কিরাতার্জুনীয়ম্' নৃত্যের আসরে। যেতে যেতে বললেন, আপনার নরকদর্শনের গোপন রহস্য পরে বলব।

সেই নৃত্যসভায় উপস্থিত ছিলেন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীও -- রবীন্দ্রনাথের পাশে। প্রথমে বুঝতে পারি নি, প্রতিমা ঠাকুর মনে করেছিলাম।

ইন্দিরাজীর সঙ্গে ওই নাচের আসরেই অনেক কথা হল।....

দিনলিপি.. শ্রীমতী গান্ধী আমার কাছে জানতে চাইলেন দেশের খবর কী। আমার তরফে উত্তর হলঃ হোম আর নার্সিংহোমে আবদ্ধ থেকে অনেকগুলি দিন কাটল, মায় শেষদিন পর্যন্ত। এইটুকু বলতে পারি বোম্বাইয়ের সমুদ্র এখন শান্ত এবং কলকাতার জনসমুদ্র ক্রমেই অশান্ত উত্তাল হয়ে উঠেছে। আব্রহ্মস্তম্ব রাজীবের গুণমুগ্ধ।

শ্রীমতী গান্ধী ভারি খুশী হলেন।

দিনলিপি... স্বর্গলোকে বাস করছি, ভাল লাগছে। পৃথিবীর কথাও ভাবছি। শ্রীমতী গান্ধীও ভাবছেন, খুব বেশি ভাবছেন। বাক্যালাপে মনে হল, দিল্লীর সরকারী দপ্তরে যে হরণ-পূরণ ঘটে গেল তার জন্যে উনি খুব চিন্তিত। ওঁর আমলে সরকারী গুপ্ততথ্য ফাঁস হবার ভয় ছিল না। কারণ ভান্ডাররক্ষীদের মধ্যে ইংরেজিনবীস ছিল সংখ্যায় স্বল্প। বিদেশীদের কাছে সংবাদ পাচার হলেও অনেক ভুল তথ্য পেত তারা। কিন্তু নতুন যারা আসছে, ইন্দিরাজীর আশঙ্কা, তারা এবার সঠিক তথ্যই ফাঁস করবে।

—o—

এই সংখ্যায় আষাঢ় ১৩৬২ শনিবারের চিঠিতে প্রকাশিত সন্তোষকুমার ঘোষের একটি গল্প "লেখকের চিঠি" পুনর্মুদ্রিত হল।

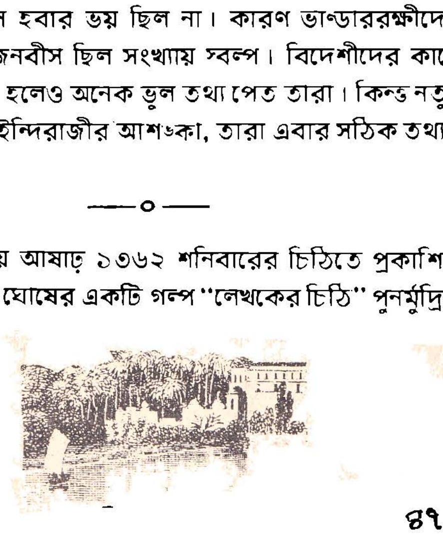

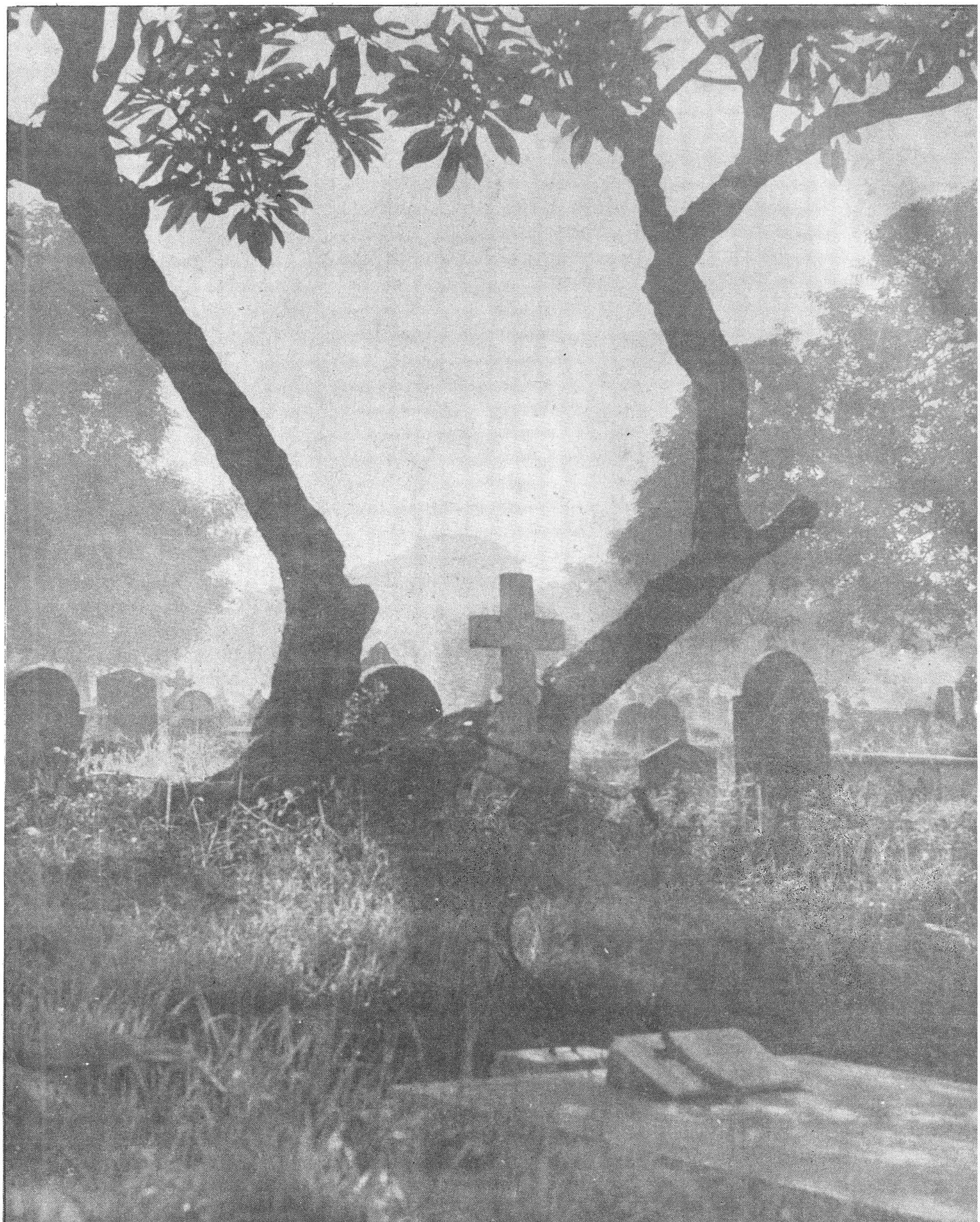

অবশেষে • ছবি: শিখর কর্মকার

বিবাহযোগ্য পাত্র-পাত্রীর অভিভাবকদের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ করিয়ে দেয়

তথ্যকেন্দ্র

১০, গভর্নমেন্ট প্লেস ইস্ট (রাজভবনের সামনে) কলি-১ ফোনঃ ২৩-৪৪৬৭

সম্পাদিকা
মঞ্জুশ্রী তালুকদার এম.এ.
উপদেষ্টা
অরুণ চট্টোপাধ্যায়
এম. এসসি., পি এইচ. ডি.

তথ্যকেন্দ্রের মাধ্যমে
বিবাহিত পাত্র-পাত্রীর সংখ্যা

জুলাই ১৯৮২	৮৯৪
জুলাই ১৯৮৩	৯৪৮
জুলাই ১৯৮৪	৯৭২

নিয়মাবলী

১। তথ্যকেন্দ্রের নির্দিষ্ট ফর্মে পাত্র-পাত্রীর সঠিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে হবে।

২ তালিকাভুক্তির জন্য পাঁচ টাকা, সার্ভিস চার্জ মাসে দশ টাকা ও বিবাহ স্থির হলে ফাইনালাইজেশন ফি দশ টাকা অর্থাৎ প্রথম মাসে মোট পনের টাকা, পরের মাস থেকে দশ টাকা ও বিবাহ স্থির হলে দশ টাকা দিতে হবে।

৩। রেজিস্ট্রেশনের এক বৎসরের মধ্যে বিবাহ স্থির না হলে পরবর্তী এক বছর বিনা ব্যয়ে তথ্যকেন্দ্রের সার্ভিস পাবেন।

* বিশেষ ক্ষেত্রে Exclusive Service এর ব্যবস্থা করা হয়

**পাত্র-পাত্রীর নির্বাচনের কাজ বিজ্ঞানসম্মতভাবে ত্বরান্বিত করার Computer Service এর ব্যবস্থা আছে

কয়েকটি মতামত

"সদস্যের সংখ্যা প্রায় বাইশ হাজার ....। যন্ত্রজ্যোতিষী (Computer) এক মিনিটেরও কম সময়ে মনে মনে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ কষে জানিয়ে দেবেন কোন্ পাত্রের উপযুক্ত কোন্ পাত্রী আর কোন্ পাত্রীর উচিত কোন্ পাত্রকে বরমাল্যে অভিষিক্ত করা।"

—আনন্দবাজার

The number of wedding under the agency's auspices since June 1972 encourages optimism. From 102 that month the figure has shot up to 408 last January. Bless the bride— and the agency"

—Statesman.

SANIBARER CHITHI □ VOL. 1.No. 20□ 9 MARCH 1985 □ Regn No. 42168/84 □ Rs. 2.00

CHALLENGE IN CONSTRUCTION

CENTRAL ENGINEERING SYNDICATE
(An Undertaking of New Central Group Engineering Pvt. Ltd.)

CENTRAL CONCRETE & ALLIED PRODUCTS (P) LTD
Registered Office—8, Camac Street, 3rd floor, Calcutta-700 017
Gram : CENTPILES, Telex : CENT IN CA-021-2331
Phones : 44-0090, 43-4262, 43-1521, 43-1554

WEST BENGAL DECLARATION NO. 202/84